সক্রেটিস

হাসান আজিজুল হক

স ক্রে টি স

সক্রেটিস

হাসান আজিজুল হক

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

সক্রেটিস

হাসান আজিজুল হক

প্রকাশক : কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রচ্ছদ : সুখেন দাস। বর্ণবিন্যাস : রুক্কু শাহ্ কম্পিউটার। মুদ্রণে : মহব্বত প্রিন্টার্স, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৫, চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১০, পঞ্চম মুদ্রণ : মে ২০১১।

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র।

SOCRATES. By Hasan Azizul Hoque. Published by : Kamolkanti Das, Jatiya Sahitya Prakash, 67 Ryaridas Road, Dhaka-1100. Computer: Ruqqu Shah Computer, Dhaka-1100. Copyright : Author. Cover Design : Sukhen Das. Printer : Mohabbat Printers. Dhaka-1205. Date of Publication : 5th Edition May 2011.

Price : Tk. 100.00, US $ 2.00

ISBN : 984-70000-0133-3

উৎসর্গ

সুচি

কল্যাণীয়াসু

আলো চারদিক থেকে আসে

'সক্রেটিস' বিষয়ে

'সক্রেটিস' বের হয় বাংলা একাডেমীর অমর একুশে গ্রন্থমেলা সিরিজের একশটি বইয়ের একটি হিসেবে, ১৯৮৬ সালে। মাত্র দুসপ্তাহের মধ্যে বইটি লেখা হয়। কিছুকাল পরে কলকাতার 'অনুষ্টুপ' প্রকাশনী থেকে এর একটি পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং বাংলা একাডেমী থেকে, আশ্চর্যের ব্যাপার, বের হয় এর দ্বিতীয় মুদ্রণ। এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দেখছি, এর একটি ছিনতাই সংস্করণ বের হয়ে গেছে ঢাকা থেকে এবং বাসে ট্রেনে পনেরো টাকা দামে বিকোচ্ছে। এই ভয়াবহ ছিনতাইয়ের যুগে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই। মামলা মকদ্দমা করেও লাভ নেই। আইন উপনিবেশিক, দায়সারা এবং গা-জ্বলুনে ঠেসমারা। এখন তড়িঘড়ি বৈধ একটা সংরস্কণ বের করে যতোটুকু রক্ষা করা যায়।

মানুষের আড়াই হাজার বছরের সভ্যতার বিশাল ওজনের খানিকটার চিরকালের বহনকারী টাইটানিক এই মানুষটি—সক্রেটিস। এখানে তাঁর জীবন কর্ম এবং ভাবনা নিয়ে বাংলায় কোনো বই নেই। সক্রেটিসের অনুরাগী হিসেবেই বইটি লিখেছিলাম। কিন্তু, পরে পাঠকদের এর প্রতি আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সেই জন্যই আর একবার প্রকাশ।

ঢাকা
৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০

হাসান আজিজুল হক

১

নানা কারণে সক্রেটিসের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু লেখা কঠিন। তাঁর সম্বন্ধে আমরা যে খুব বেশি জানি, একথা বলা যায় না। অন্যদিকে কিছুই জানা নেই বলাও চলে না। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, সক্রেটিস সম্বন্ধে আমাদের কম জানা আছে, না বেশি জানা আছে, সেটা স্থির করাই মুশকিল। সক্রেটিসের জীবন ও মতবাদ বিষয়ে এইরকম জটিলতা কেন তা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। আপাতত তাঁর সম্বন্ধে যে তথ্যগুলি খানিকটা নির্দ্বিধায় দেওয়া চলে, সেগুলিই তুলে ধরা যাক। তাঁর জন্ম এথেন্সে ৪৬৯ বা ৪৭০ খ্রিস্টপূর্ব সালে। জন্মসূত্রে এথেনীয় সক্রেটিসের পরিবারের অবস্থা বোধহয় তেমন মন্দ ছিল না। তাঁর বাবার নাম সফ্রোনিস্‌কস্‌। তিনি ছিলেন এ্যালোপেকি গোষ্ঠীর লোক। এটি এথেন্সের দশটি প্রধান গোষ্ঠীর একটি। সক্রেটিসের পরিবার ডেইডালস থেকে নিজেদের বংশক্রম গণনা করতো। এ থেকে বোঝা যায়, পরিবারটি বনেদি। সক্রেটিসের বাবার জীবিকা কি ছিলো নিশ্চয় করে বলা চলে না, কেউ কেউ অবশ্য বলেন তিনি ভাস্কর ছিলেন এবং তাঁর পুত্র সক্রেটিসও যৌবনে ভাস্কর্যকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এথেন্সের এ্যাক্রোপলিসে রাখা কিছু মূর্তি সক্রেটিসের তৈরি বলে দেখানোও হতো। সে যাই হোক, সফ্রোনিস্‌কস্‌ যে কিছু সম্পত্তি পরিবারের জন্যে রেখে যেতে পেরেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সক্রেটিস ভারি অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনীতে কাজ করেছিলেন। কিছু সহায়-সম্পত্তি না থাকলে সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ সেকালে জুটতো না।

সক্রেটিসের মায়ের নাম ফেনারিটি। পেশায় তিনি ধাত্রী ছিলেন। প্যাট্রোক্লিস নামে অন্য স্বামীর ঔরসজাত তাঁর এক পুত্র ছিলো। পরবর্তী জীবনে সক্রেটিস তাঁর মায়ের পেশার তুলনা দিতে পছন্দ করতেন, বলতেন, তিনিও তাঁর মায়ের মতো ধাত্রীর কাজই করে থাকেন। তবে তাঁর মা মানব-শিশু প্রসবে সহায়তা করতেন, তিনি সহায়তা করে থাকেন চিন্তা-ভাবনা প্রসবের বেলায়।

সাধারণ এথেনীয় নাগরিকের জীবনের সঙ্গে সক্রেটিসের দৈনন্দিন জীবনের কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। অন্তত বাইরে থেকে। খুব সাধারণ বিবাহিত পারিবারিক জীবন তিনি কাটিয়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলো জানথিপি। এই মহিলা ঝগড়াটে বদমেজাজি ছিলেন বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে, প্লেটোর রচনায় তার কোনো সমর্থন মেলে না। তাঁদের তিন সন্তান : ল্যাম্প্রোক্লিস, সফ্রোনিস্‌কস্‌,

মিনিক্সিনস্। সত্তর বছর বয়সে সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড যখন কার্যকর করা হয়, তখন তাঁর বড়ো ছেলেটি বালকমাত্র, অন্য দুটি নিতান্তই শিশু, ছোট ছেলেটি বলতে গেলে সদ্যোজাত। মনে হয় সক্রেটিস বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন। এ্যারিস্টক্সিনস্ নামে একজন কেলেঙ্কারি-ঘাঁটা লোক সক্রেটিসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিবাহের অভিযোগ আনার চেষ্টা করে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর নিজ গোষ্ঠীর প্রভাবশালী ব্যক্তি এ্যারিস্টেইডিসের কন্যা মায়াতোকে বিবাহ করেছিলেন। কথাটা সত্য বলে মনে হয় না। হিসেব করলে দেখা যায় মায়াতো বয়সে সক্রেটিসের চেয়ে বেশ বড়ো ছিলেন। অন্যদিকে পত্নী জানথিপির সঙ্গে সক্রেটিসের সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিলো বলেই ধারণা করা যায়। 'ফিডো'-তে (প্লেটোর যে ডায়ালগটিতে সক্রেটিসের মৃত্যুদৃশ্যের অসাধারণ বর্ণনা আছে) বলা হচ্ছে কারাগারের দরজা যখন খুলে দেওয়া হয়, তখন সক্রেটিসের বন্ধুরা দেখতে পান যে জানথিপি তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে সেখানে রয়েছেন। স্পষ্টত তাঁরা সেখানে রাত কাটিয়েছেন। জানথিপির দেহমনের উপর দিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। সক্রেটিস তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন কিন্তু দুপুরের দিকে তিনি আবার পরিবারের অন্য মহিলাদের নিয়ে ফিরে আসেন এবং সক্রেটিসের কাছ থেকে শেষবারের মতো উপদেশ নির্দেশ গ্রহণ করেন।

সক্রেটিসকে হেমলক বিষপানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তখন তাঁর বয়স সত্তরের একটু বেশি। পাঠকরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন সক্রেটিসের জীবনের যে মূল তথ্যগুলি দেওয়া হলো, তা থেকে বোঝা যায় না তাঁর বাল্য এবং কৈশোর কিভাবে কেটেছিলো, ঠিক কি উপায়ে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হতো, কোনো নির্দিষ্ট পেশা তিনি আদৌ গ্রহণ করেছিলেন কিনা। শুধু এইটুকুমাত্র বোঝা যায় যে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে তাঁকে কখনোই দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় নি। তবে একথা ঠিক, সারাজীবন তাঁকে দারিদ্র্যের ধার ঘেঁষেই চলতে হয়েছে, ধনৈশ্বর্যের স্বাদ কখনো পান নি। অবশ্য সেটা তাঁর কাম্যও ছিলো না এবং একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ধনসম্পদ আপনা আপনি তাঁর চারপাশে স্তূপাকার হয়ে জমে উঠলেও তিনি তা স্পর্শ করতেন না। জীবন রক্ষার জন্যে ন্যূনতম দরকারটার কথা বাদ দিলে সক্রেটিসের মতো জাগতিক প্রয়োজন থেকে এমন সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ ইতিহাসে কমই দেখা যাবে। পোশাক পরতেন খুবই সাধারণ। মোটা খসখসে কর্কশ ছিলো তাঁর জামাকাপড় আর সে সব পরার মধ্যেও ছিরিছাঁদ বলতে কিছু ছিলো না। খালি পায়ে থাকতেন বেশির ভাগ সময়। শীতে-গ্রীষ্মে, এমন কি বরফের উপর দিয়েও তিনি অবলীলাক্রমে খালি পায়ে চলাফেরা করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, এথেন্সের বাজারে, ভোজসভায় সর্বত্রই এই হচ্ছেন আটপৌরে সক্রেটিস। তাঁর কষ্টসহিষ্ণুতা ছিলো প্রবাদ কাহিনীর মতো আর সাহস ছিলো সীমাহীন। পেলোপনিশীয় যুদ্ধে কয়েকবার তিনি অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য ছিলো পরিমাপহীন। প্লেটোর ডায়ালগ 'সিম্পোজিয়াম'-এ সক্রেটিসের শিষ্য আল্‌কিবিয়াডিস (এথেন্সের বিরুদ্ধে

বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন) একটি সামরিক অভিযানে সক্রেটিসের বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে :

> তাঁর সহনশক্তি এককথায় ছিলো বিস্ময়কর। সরবরাহ থেকে বিযুক্ত হয়ে যখন আমাদের উপোস করতে বাধ্য হতে হচ্ছিলো—যুদ্ধকালে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে—তখন সক্রেটিস শুধু আমাকে কেন, যে কাউকে সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় অতিক্রম করে যেতেন। বস্তুত এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা চলে না।...ঠাণ্ডা সইবার ক্ষমতাও তাঁর ছিলো অসাধারণ। একবার প্রচণ্ড বরফপাত হলো। এ অঞ্চলটায় সত্যিই শীত বড় মারাত্মক, প্রত্যেকে হয় গৃহবন্দী থাকতেন, না হয় বিপুল পরিমাণ কাপড়চোপড় পরে বাইরে বেরুতেন এবং অবশ্যই প্রত্যেকের পায়ে মজবুত জুতো, ফেল্ট বা পশম দিয়ে পা-জোড়া পুরোপুরি ঢাকা। এইরকম অবস্থায় বরফের উপর সৈনিকদের চেয়ে ভালো কুচকাওয়াজ করতেন। এইজন্যে অন্যেরা তাঁকে বিষদৃষ্টিতে দেখতো, কারণ মনে হতো সক্রেটিস তাদের অবজ্ঞা দেখাচ্ছেন।

একদিকে স্বাবলম্বিতা, শুদ্ধতা, আত্মসংহতি অন্যদিকে মানবিক করুণা ও সামাজিক আকর্ষণীয়তায় পরিপূর্ণ, সংস্কৃতিবান, তীক্ষ্ণধী, সদাপ্রসন্ন এবং অবিচলিত প্রশান্তির প্রতিমূর্তি সক্রেটিস সর্বস্তরের মানুষের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

এককথায় তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় মুক্ত পুরুষ। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো বৃত্তির বশ্যতা স্বীকার করেন নি কখনো। জেলার লিখেছেন :

> এথেন্সের বাজারের ভিতর দিয়ে তিনি যখন হাঁটতেন, দুপাশের ভোগ্যদ্রব্যে পূর্ণ দোকানগুলির দিকে চেয়ে বলতেন, 'এসবের কোনো কিছুতেই আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই।'

আগেই বলা হয়েছে, সক্রেটিসের বাল্য বা কৈশোর জীবন সম্বন্ধে আমাদের তেমন কিছু জানা নেই। শুধুমাত্র এইটুকু আন্দাজ করা চলে যে সাধারণ এথেনীয় বালক যে শিক্ষা পেতে পারতো, সক্রেটিস তাঁর চেয়ে একটুও বেশি পান নি। সক্রেটিসকে পুরোদস্তুর স্বশিক্ষিত দার্শনিক বলা যায়। পরবর্তীকালে দার্শনিকরা যে তাঁকে আর্চেলসের শিষ্য বলে বর্ণনা করেছেন, জেলারের মতে তার কারণ হচ্ছে সক্রেটিসের সঙ্গে গ্রীসের বয়োজ্যেষ্ঠ দার্শনিকদের যোগাযোগ দেখানো। কিন্তু বার্নেট বলেছেন, সক্রেটিস যে আর্চেলসের শিষ্য ছিলেন তাতে সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। সমসাময়িক বিয়োগান্তক কবি আয়ন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, সক্রেটিস আর্চেলসের সঙ্গে সামোস-এ এসেছিলেন। ৪৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সামোস অবরোধ উপলক্ষে সফোক্লিস এবং পেরিক্লিস যে ওখানে গিয়েছিলেন তার উল্লেখও ঐ স্মৃতিকথায় আছে। এই সময় সক্রেটিসের প্রায় আটাশ বছর বয়স। যে কেলেঙ্কারি রচনাকারী এ্যারিস্টক্সিনসের কথা আগে বলা হয়েছে, তিনিই আবার আর্চেলসের সঙ্গে সক্রেটিসের সম্পর্ক নিয়ে বিশ্রী কলঙ্ক ছড়িয়ে বেড়ান। এসব থেকে অন্তত একটি কথা পরিষ্কার যে আর্চেলসের সঙ্গে সক্রেটিসের গুরুশিষ্য সম্পর্ক

ছিলো। তবু কথাটা কিন্তু থেকেই যায় যে সক্রেটিস স্বশিক্ষিত দার্শনিক এবং যৌবনেই তিনি নিজস্ব দার্শনিক চিন্তাধারার একটা পথ তৈরি করে নেয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের হাতে তথ্য তেমন কিছু নেই এবং সক্রেটিসের যৌবনকালের চিত্রটা কিছুতেই তেমন স্পষ্ট করে আঁকতে পারা যাচ্ছে না।

উপরে যা লেখা হলো তার সঙ্গে আর এইটুকু যোগ করা যায় যে সমসাময়িককালের গ্রীসের দর্শনের সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় ঘটেছিলো। এথেন্স না বলে গ্রীস বলা হচ্ছে এই কারণে যে এথেন্স তখনো দর্শনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে নি। সক্রেটিসের যৌবনকালের দার্শনিকদের সকলেই এথেন্সের বাইরের মানুষ। পারমিনাইডিস এবং জেনো দুজনেই ইলিয়ার অধিবাসী ছিলেন। থেলিস, হেরাক্লিটাস, পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, এ্যানাক্সাগোরাস কেউই এথেন্সের মানুষ ছিলেন না। এথেনীয় দার্শনিক বলতে গেলে আমাদের শেষ পর্যন্ত সক্রেটিস এবং প্লেটোর নামই করতে হয়। জীবনের প্রধান অংশটি এথেন্সে কাটলেও অ্যারিস্টটল স্টাগিরার লোক ছিলেন। সে যাই হোক, সক্রেটিস গ্রীক প্রকৃতি-দর্শন বা আরো ভালো করে বলতে গেলে প্রকৃতি-বিজ্ঞান ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন এবং এটা মনে করার কারণ আছে যে যৌবনে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের খানিকটা চর্চাও করেছিলেন। পরে তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চা শুধু ছেড়েই দেন না, তার প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সে আলোচনা পরে।

এই একই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলতে হয়। সাধারণভাবে সক্রেটিসকে সোফিস্টদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হতো। কিন্তু সত্যি সত্যিই তাঁর অবস্থান সোফিস্টদের থেকে শত যোজন দূরে। সে আলোচনাও পরে করা যাবে। শুধু এইমাত্র এখানে মনে রাখা দরকার যে, সোফিস্টদের চিন্তার সঙ্গে যৌবনেই সক্রেটিসের পরিচয় ঘটেছিলো এবং তিনি সোফিস্টদের মধ্যে প্রোটাগোরাস, হিপ্পিয়াস, প্রোডিকস এবং জর্জিয়াসকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন।

সক্রেটিস সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিন কি চার বার ছাড়া সারাজীবনে তিনি এথেন্সের বাইরে যান নি। এই তিন চারবার যে গেছেন, তাও বাধ্য হয়ে। সামরিক অভিযানে তাঁকে তিন বার অংশগ্রহণ করতে হয়—পোটেইভিয়ায় ৪৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ; ডেলিয়ন এবং এ্যাম্ফিপোলিস-এ যথাক্রমে ৪২৪ এবং ৪২২ খ্রিস্টপূর্ব সালে। সম্ভবত আর একবার মাত্র খুব বড়ো একটি উৎসব উপলক্ষে তিনি এথেন্সের বাইরে গিয়েছিলেন।

সক্রেটিস সম্বন্ধে যে কয়টি তথ্য নিঃসন্দেহ হয়ে দেওয়া যায় কেবল সেই কয়টিই এখানে পরিবেশন করার কথা ছিলো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এর মধ্যেই আমরা খানিকটা ছায়াময় এলাকায় ঢুকে পড়েছি। তার কারণ আছে এবং আর এগোবার আগে সেই কারণ ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে শুধুমাত্র নিশ্চিত তথ্য থেকে সক্রেটিস সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে এথেন্সে সক্রেটিস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না, তাঁর পেশা বা

জীবিকা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা কঠিন। তবে তিনি শেষ বয়সে এথেন্সের শাসকদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন এবং কয়েকটি অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড পেয়ে ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হেমলক বিষপানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

সুনিশ্চিত তথ্যের এই স্বল্পতার জন্যেই বার্নেট এক জায়গায় লিখেছেন, 'এই কথাটাই সরাসরি বলে ফেলা ভালো যে সক্রেটিস সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানতে পারি না এবং আমাদের জন্যে তিনি একজন 'এক্স' হয়েই থাকবেন।' একথা বলার পরেই কিন্তু তিনি আবার বলেছেন, সক্রেটিস অন্য এক হিসেবে আমাদের কাছে রক্তমাংসের জলজ্যান্ত মানুষ হিসেবেই ধরা পড়েছেন। সত্যিই, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না বলার পরেও আমাদের বলতে হয় যে সক্রেটিস সম্বন্ধে আমরা এতোটাই জানি যেন তিনি এই গতকালই আমাদের মধ্যে জীবনযাপন করে গেছেন। পরস্পর বিরোধী এই দুটি কথার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে, সক্রেটিস সম্বন্ধে যাকে বলে ঐতিহাসিক তথ্য তার প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। তিনি নিজে কিছু লেখেন নি। যদি কিছু লিখেও থাকেন তার একটি শব্দও কেউ কোনোদিন খুঁজে পায় নি। তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন না, সাধারণ অর্থে দার্শনিকও না। কোনো দর্শনই তিনি নির্মাণ করেন নি, কয়েকটি মাত্র দার্শনিক বাক্য বা আরো ভালো করে বলতে গেলে প্রজ্ঞাবাক্য তাঁর মুখনিঃসৃত বলে চালু আছে।

তাহলে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের এত জানা আছে বলার অর্থ কি ? এই রহস্যটি এইবার মোচন করার চেষ্টা করা যাক। সক্রেটিসকে জানবার দুটিমাত্র উৎস আমাদের কাছে খোলা আছে। এক. জেনোফনের রচনা, দুই. প্লেটোর 'ডায়ালগগুচ্ছ'। এছাড়া মিলনান্তক নাটক রচয়িতা এ্যারিস্টোফেনিসের নাটক 'দি ক্লাউডস'-এ সক্রেটিসের ব্যঙ্গচিত্র আছে। এ্যারিস্টটলের রচনায় সক্রেটিসের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা আছে, কিন্তু তাতে আমাদের কোনো সহায়তা হচ্ছে না। এ্যারিস্টটলের জন্ম হয়েছে সক্রেটিসের মৃত্যুর পনেরো বছর পরে। কাজেই ব্যক্তি সক্রেটিসের জীবন, তাঁর প্রকৃতি, চরিত্র ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে জানতে গেলে আমাদের জেনোফন ও প্লেটোরই দ্বারস্থ হতে হয়। আর ঠিক এখানেই সমস্যা। জেনোফন এবং প্লেটো দুজনেই সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁরা সক্রেটিসের একরকম চিত্র দিচ্ছেন না। এঁদের দুজনের বর্ণিত সক্রেটিস একরকম নয়। দুজনের আঁকা সক্রেটিস এত বিভিন্ন যে তাঁদের মধ্য থেকে প্রকৃত সক্রেটিসকে বেছে নেওয়া একরকম অসম্ভব। মনে হতে পারে, প্লেটো বর্ণিত সক্রেটিস আসলে প্লেটোর কল্পনা-সৃষ্ট, বাস্তব সক্রেটিসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই এবং জেনোফনের সক্রেটিস জেনোফনের মনগড়া, বাস্তব সক্রেটিস থেকে অনেক দূরে। এরকম মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এই দুই সক্রেটিসের পরস্পরবিরোধিতার ফলে মূল সক্রেটিস সম্বন্ধে আর কোনো ধারণাই করা যাচ্ছে না। বিষয়টিকে একটু তলিয়ে দেখা যাক।

জেনোফন ছিলেন একজন সৈনিক। যুবা বয়সে তিনি সক্রেটিসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সক্রেটিস তখন বৃদ্ধ, তাঁর মৃত্যুদণ্ড পাবার অল্পকাল মাত্র বাকি

আছে। মোট তিন চারখানা রচনা জেনোফন আমাদের জন্যে রেখে গেছেন—ভাবখানা যেন এই যে তিনি সক্রেটিসের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন। সাইরাসের অভিযানে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেবার ব্যাপারে জেনোফন নাকি সক্রেটিসের পরামর্শ চেয়েছিলেন। এই সময় জেনোফনের বয়স তিরিশের নিচে। যুদ্ধাভিযান থেকে জেনোফন যখন ফিরে আসেন, ততোদিনে সক্রেটিসের মৃত্যু ঘটে গেছে। সক্রেটিস-সংক্রান্ত জেনোফনের রচনাগুলি হচ্ছে : এক. 'দি কমপ্লিট হাউসহোল্ডার', দুই. 'এ্যাপোলজি', তিন. 'সিম্পোজিয়াম' এবং চার. 'মেমোরাবিলিয়া'। অদ্ভুত ব্যাপার, প্লেটোরও 'এ্যাপোলজি' এবং 'সিম্পোজিয়াম' নামে দুটি ডায়ালগ আছে। নাম দুটি জেনোফন স্পষ্টত প্লেটোর কাছ থেকে নিয়েছেন। সক্রেটিস সম্বন্ধে জানার জন্যে আজকাল আর কেউ জেনোফনের আগের তিনটি রচনা থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে বলে মনে করেন না। একমাত্র তাঁর চতুর্থ রচনা 'মেমোরাবিলিয়া'কেই সক্রেটিস-সংক্রান্ত তথ্যের উৎস বলে ধরা হয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই বইটির উপর পুরোপুরি আস্থা রাখা নিরাপদ নয়। বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বলে জেনোফনের তেমন সুনাম নেই। মনগড়া গালগল্প বলতে তিনি পছন্দ করতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন সৈনিক, রাসেল মৃদু শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন, প্রকৃতিদত্ত মস্তিষ্কের পরিমাণ তাঁর তেমন বেশি ছিলো না। কাজেই সক্রেটিসের চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে কিছু শোনা বাহুল্যমাত্র। নানারকম কুসংস্কারে তাঁর মন পরিপূর্ণ ছিলো। সক্রেটিসের কথা লেখার সময় সেইসব সংকীর্ণতা অবশ্যই কাজ করেছে। যেহেতু বুদ্ধি জিনিসটা তাঁর তেমন একটা ছিলো না, সেজন্যে অনেকে বলেছেন, জেনোফনের বর্ণনাই খাঁটি, কারণ মিথ্যা বানাবার প্রতিভা তাঁর ছিলো না। এই যুক্তি কিন্তু ঠিক নয়, কারণ তলিয়ে দেখার ক্ষমতা না থাকার ফলে নির্বোধেরা নিজেদের ভাবনা-চিন্তাকেই সত্য বলে কল্পনা করে থাকে। একথাটিও রাসেলের। সে যাই হোক, যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা এই যে সক্রেটিসকে জেনোফন দেখেছিলেন বেশ অল্প বয়সে, অল্প সময়ের জন্যে এবং সাইরাস অভিযান শেষে ফিরে এসে সক্রেটিসের দর্শনলাভের সুযোগ আর তাঁর হয় নি। সক্রেটিস তখন পরলোকে। ফলে, শেষ বয়েসের সক্রেটিসের একটি নেহাত আংশিক ও ক্ষণিক চিত্রই তিনি পেয়েছিলেন এবং সেই চিত্রটাই তিনি আমাদের দিয়েছেন। অতএব, জেনোফনের সক্রেটিস অসম্পূর্ণ। যেটুকু-বা আছে, তা সত্য কিনা সে তো পরের কথা। এর পরে যে কথাটি বলা দরকার তা এই যে 'মেমোরাবিলিয়া' বইটি আসলে একটি কৈফিয়ৎমূলক রচনা। এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সক্রেটিসের সমস্ত আচরণ ও কার্যকলাপের কৈফিয়ৎ দেওয়া এবং সেগুলিকে সমর্থন করা। এরকম একটা অপরাধ-স্খালনমূলক বইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা তেমন বেশি নয়। যে অধার্মিকতার অভিযোগে সক্রেটিসকে অভিযুক্ত হতে হয়েছিলো, জেনোফন তাঁর রচনায় তা খণ্ডন করতে চেয়েছেন এই বলে যে সক্রেটিস আদৌ অধার্মিক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ এবং এথেন্সের তরুণ সমাজের উপর তাঁর প্রভাব কল্যাণকরই হয়েছিল। জেনোফনের

বর্ণনা থেকে যে সক্রেটিসের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁর কোনো রকম বৈশিষ্ট্য ছিলো বলেই মনে হয় না। প্রথা ও সংস্কারভীরু এক সক্রেটিসের চিত্র এঁকেছেন তিনি। শুধুমাত্র আপন ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের জোরে যে সক্রেটিস ইতিহাসের প্রায় আড়াই হাজার বছরের বিবর্ণ ধূসর পাতাগুলি ছাপিয়ে আমাদের কাছে রক্তমাংসের মানুষের চেয়ে সজীব হয়ে রয়েছেন, জেনোফনের 'মেমোরাবিলিয়া'তে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। জেনোফনের দেওয়া সক্রেটিসের চিত্রই যদি সত্য হয়, তাহলে বোঝা যায় না সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো কেন ? বার্নেট লিখেছেন, 'জেনোফনের সক্রেটিস-সমর্থন বড়ো বেশি সফলতার সঙ্গে করা হয়ে গেছে। তিনি যদি ঐ রকমই হতেন তাহলে তাঁকে কখনো হত্যা করা হতো না।' বার্নেট আরও বলেছেন সক্রেটিসের পক্ষে সাফাই দিতে গিয়ে এবং সেই সাফাইকে নিশ্ছিদ্র করতে গিয়ে জেনোফন সক্রেটিসের ব্যক্তিত্বকে বর্ণহীন, একঘেয়ে ও প্রথাসিদ্ধ করে ফেলেছেন। যে জ্বলন্ত মতাদর্শের অগ্নিগর্ভ বাহক ছিলেন তিনি, যাকে গণতন্ত্রীরা ভয়ঙ্কর উৎপাত বলে বিবেচনা করতেন, তার কোনো পরিচয়ই জেনোফনের রচনায় নেই। তাছাড়া নানারকম স্ববিরোধিতায় 'মেমোরাবিলিয়া' ভর্তি। সক্রেটিসের ধর্মপ্রাণতা প্রমাণ করার অতি উৎসাহে জেনোফন লিখেছেন, সক্রেটিস প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উপর ভয়ানক খাপ্পা ছিলেন এবং এর চর্চা করা থেকে সবাইকে বিরত থাকতে বলতেন। জেনোফন বলতে চান, সক্রেটিস জড়বাদী নাস্তিক ছিলেন না, কারণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের চর্চা মানুষকে জড়বাদী করে তোলে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি সক্রেটিসের বিমুখতার খবরটা জেনোফন খুবসম্ভব প্লেটোর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কারণ প্লেটো এক জায়গায় এ্যানাক্সাগোরাসের মতবাদে সক্রেটিসের হতাশার কথা জানিয়েছেন। এ্যানাক্সাগোরাস সূর্যকে লাল উজ্জ্বল প্রস্তর বলেছিলেন। অন্যদিকে আবার জেনোফন সক্রেটিসের প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি বিমুখতার কথা বলেই বুঝতে পারেন বড়ো বেশি বলা হয়ে গেল। সেজন্য সেটাকে সামলাতে বার বার দুবার বলে নেন, 'তবু এইসব বিষয়ে (প্রকৃতি-বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি) তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিলো'—এবং কি কি বিষয়ে সক্রেটিসের পাণ্ডিত্য ছিলো তার একটা তালিকাও দিয়ে দেন। এই তালিকাটি কিন্তু সেকালের সবচেয়ে পরিণত গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার তালিকার অনুরূপ অর্থাৎ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে সক্রেটিস গভীর আগ্রহে প্রথম বয়সে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেছিলেন। মোট কথা হচ্ছে, জেনোফন সৈনিক ছিলেন, নতুন মতবাদ বা চিন্তাধারা তাঁর স্থূল মস্তিষ্কে জায়গা করতে পারতো না। সেজন্যে রাই কুড়িয়ে বেল তৈরি করার দিকে তাঁকে মন দিতে হয়েছিলো। নানা সূত্র থেকে তিনি সক্রেটিস-সংক্রান্ত খবর সংগ্রহ করেছিলেন এবং কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁর দেওয়া খবরের বড়ো অংশটি প্লেটোর 'ডায়ালগগুচ্ছ' থেকেই আহৃত। ফল হয়েছে এই যে জেনোফন সক্রেটিসের সুসঙ্গত চরিত্র নির্মাণ করতে পারেন নি। তাঁর লেখা পড়লে সক্রেটিসকে একবার একধরনের ব্যক্তি মনে হয়, পরক্ষণেই ভিন্ন ধরনের মানুষ বলে ধারণা হয়। আসলে সক্রেটিসের মতো যুগন্ধর বিরাট প্রতিভাকে

এমনকি কল্পনার মধ্যেও ঠাঁই দিতে না পেরে জেনোফন তাঁকে নিজের মাপ মতো কেটে ছোটো বিশেষত্বহীন সাধারণ মাপের করে নেন। তবু এটা স্বীকার করতে হবে যে জেনোফন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সক্রেটিসের অনেক অন্তরঙ্গ ছবি তুলে ধরেছেন। সক্রেটিস সংক্রান্ত তাঁর গল্পগুলি আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য। সক্রেটিস চাইতেন যোগ্য লোক যোগ্য স্থানে থাকুক। এইজন্যে তিনি সব সময় এইভাবে প্রশ্ন করতেন 'আমার জুতোজোড়া যদি মেরামত করতে চাই, তাহলে সে কাজ কাকে দিয়ে করানো ঠিক হবে ?' যাদের এই প্রশ্ন করা হতো তাদের মধ্য থেকে কেউ একজন অবধারিত উত্তর দিত, 'অবশ্যই একজন চর্মকারকে'। এইভাবে সক্রেটিস ছুতোর, কামার ইত্যাদি প্রসঙ্গে এসে প্রশ্ন করতেন, 'তাহলে রাষ্ট্র নামক জাহাজটি বিগড়োলে কাকে দিয়ে সারাইয়ের কাজ করাবো ?' 'তিরিশ-স্বৈরাচারী'র শাসনের সময় যখন সক্রেটিসের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ ঘটে তখন তাঁদের প্রধান ক্রিটিয়াস সক্রেটিসকে যুবকদের কুশিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেন এবং মন্তব্য করেন : 'আপনি বরং আপনার চর্মকার, কর্মকার, ছুতোর ইত্যাদি ব্যাপার চুকিয়ে ফেললেই ভালো করবেন—কারণ আপনি ইতোমধ্যে তাদের যেরকম চালু করে ফেলেছেন, তাতে তারা সবাই গোড়ালির কাছে ভালোমতো ক্ষয়ে এসেছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ক্রিটিয়াস সক্রেটিসের কাছে বেশ কিছুদিন তালিম নিয়েছিলেন এবং সক্রেটিসের কথাবার্তার ধরন-ধারণ ভালো জানতেন।

জেনোফন প্রসঙ্গের পরেই এ্যারিস্টোফেনিসের কথা। এ্যারিস্টোফেনিস মিলনান্তক নাট্যকার ছিলেন। ৪২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি ক্লাউডস্ (মেঘদল) নামে একটি নাটক লেখেন। ঐ নাটকে সক্রেটিসের ব্যঙ্গচিত্র আছে। নাটকটি ভালো না মন্দ, সক্রেটিসের যে ছবি এই নাটকে পাওয়া যায় তা সত্য না মিথ্যা, এসব প্রশ্ন না তুলে বলা যায় ঐ নাটকে সক্রেটিসের প্রতি নাট্যকারের এবং সমসাময়িককালের এথেনীয় সমাজের একাংশের অপ্রসন্নতা প্রকাশ পাচ্ছে। এই অপ্রসন্নতার পিছনে যথেষ্ট কারণ ছিলো কিনা সে প্রশ্নের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে অপ্রসন্নতা যে ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৪২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন নাটকটি রচিত হয়, তখন সক্রেটিসের বয়স সাতচল্লিশ এবং প্লেটো ও জেনোফন দুজনই বালকমাত্র। কাজেই যে বয়সের সক্রেটিসের ব্যঙ্গচিত্র নাটকটিতে দেখানো হয়েছিল সে বয়সের সক্রেটিসকে প্লেটো বা জেনোফন কেউ প্রত্যক্ষ করেন নি। আসলে 'ক্লাউড্স্' নাটকে যুবক সক্রেটিসের চিত্রই আছে। এ্যারিস্টোফেনিস যুবা বয়সের সক্রেটিসকে নিয়ে যতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই করুক না কেন, নাটক রচনাকালের সাতচল্লিশ বছর বয়সের সক্রেটিসের প্রতি তাঁর যে তেমন বিরাগ ছিল এমন প্রমাণ নেই। 'ক্লাউড্স্' নাটক অভিনয়ের ছয় সাত বছর পরের একটা সময়ের বর্ণনায় প্লেটো তাঁর ডায়ালগ 'সিম্পোজিয়াম'-এ দেখাচ্ছেন এ্যারিস্টোফেনিস ও সক্রেটিস পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুই রয়েছেন। নাটকটি যখন রচিত এবং অভিনীত হয়, তখনো সক্রেটিসকে নিয়ে কোনো কথা হয় নি এবং সক্রেটিস বা তাঁর অনুসারীরা কেউই এটাকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। তাছাড়া নাটকটি অভিনয়ের আগের ও পরের বছর সক্রেটিস যথাক্রমে

ডেলিয়ন এবং এ্যাম্ফিপোলিস যুদ্ধাভিযানে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এইসব থেকে বোঝা যায়, 'ক্লাউড্স্'-এ যুবক সক্রেটিসের তীব্র ব্যঙ্গচিত্র থাকলেও নাটকটি অভিনীত হবার সময়ে তা নির্দোষ আমোদ-প্রমোদই জুগিয়েছিল। 'ক্লাউড্স্' বিষ ছড়ায় অনেক পরে, ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সক্রেটিসের বিচারের সময় প্লেটো তাঁর ডায়ালগ 'এ্যাপোলজি'তে দেখিয়েছেন সে সক্রেটিস আত্মপক্ষ সমর্থনে যে বক্তৃতা দেন তাতে তাঁর প্রতি এথেন্সবাসীদের বিরূপ মনোভাব প্রমাণ করার জন্যে 'ক্লাউড্স্' নাটকের উল্লেখ করেছিলেন। খুবই সম্ভব যে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে বিচারকদের মনে 'ক্লাউড্স্' নাটকের সক্রেটিসের ছবি বার বার ভেসে উঠেছিলো।

'ক্লাউড্স্' নাটকে আছে কি ? প্রথমেই বলতে হয় যে সক্রেটিস এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নাটকে দেখানো হয়েছে সক্রেটিস বাতাসে হেঁটে বেড়াচ্ছেন এবং আকাশের মধ্যে ও মাটির নিচে অবস্থিত বস্তুপুঞ্জ সম্বন্ধে অনবরত প্রলাপ বকছেন। আকাশ-পাতাল ভাবনা যাকে বলে।

'ক্লাউড্স্' নাটকটি যে ব্যঙ্গাত্মক রচনা তাতে সন্দেহ নেই। বাড়াবাড়িই এই ধরনের রচনার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই সক্রেটিসের যে চরিত্রের পরিচয় এই নাটকে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বাস্তব সক্রেটিসের তেমন সম্পর্ক না থাকারই কথা। কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে গেলেও তার একটা ভিত্তি থাকা দরকার। অতএব 'ক্লাউড্স্'-এ সক্রেটিসের ব্যক্তিচরিত্রের পেছনে কিছু বাস্তব ভিত্তি ছিলো বইকি। একটা কথা অন্তত পরিষ্কার যে যৌবনে সক্রেটিস প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং আকাশের বস্তুনিচয় (অর্থাৎ সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি) এবং পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগের বিষয় নিয়ে কিছু জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন। প্লেটোর ডায়ালগেও দেখা যাচ্ছে যে সক্রেটিস নিজে এগুলিকেই তাঁর যৌবনের প্রধান অধ্যয়ন ও চর্চার বিষয় বলে স্বীকার করেছেন। এ্যারিস্টোফেনিস তাঁর নাটকে দেখিয়েছেন সক্রেটিস যাঁর মতবাদের অনুসারী তাঁর নাম ডায়োজিনিস। এই ডায়োজিনিস এ্যানাক্সিমিনিসের 'বায়ু'তত্ত্ব নতুন করে হাজির করেছিলেন। 'বায়ু'তত্ত্ব অনুসারে প্রতিটি বস্তুই ঘনীভূত অথবা হালকা-হয়ে-যাওয়া বায়ু থেকে উদ্ভূত। যেমন মেঘ ঘনীভূত বায়ু ছাড়া আর কিছুই নয়। প্লেটোর ডায়ালগে দেখতে পাই, সক্রেটিস স্বীকার করেছেন যে, আমরা বায়ু দ্বারা চিন্তা করি, না রক্ত দ্বারা চিন্তা করি এই প্রশ্ন নিয়ে একসময় তিনি বেশ মাথা ঘামিয়েছেন। এ্যারিস্টোফেনিসও দেখাচ্ছেন সক্রেটিস একটা বিরাট বাক্সের দোলনায় চড়ে দুলছেন যাতে উচ্চ চিন্তা করার জন্যে তিনি বিশুদ্ধ ও শুষ্ক বাতাস পান। সক্রেটিস যে চিন্তা জন্ম দেওয়ার দাইয়ের কাজ করেন বলে থাকেন সে খবরও এ্যারিস্টোফেনিসের জানা আছে। কারণ তিনি গর্ভপাতের সঙ্গে তুলনা করে চিন্তার গর্ভপাত নিয়ে ঠাট্টা করেছেন।

সে যাই হোক, এসবই যৌবনের সক্রেটিসের কথা। যে চিন্তা ও দর্শনের জন্যে পরিণত সক্রেটিস আমাদের পরিচিত, যা তাঁর মৌলিক অবদান, তার সঙ্গে যুবক সক্রেটিসের এইসব ভাবনা-চিন্তার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু 'ক্লাউড্স্'

নাটক থেকে এই কথাটা পরিষ্কার হচ্ছে যে প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি এথেন্সের জনমতামত তেমন অনুকূল ছিলো না। অন্তত ৪২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নাটকটির রচনাকালে ছিলো না। হয়তো প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে দেব-দেবী ভিত্তিক মৌলিক ধর্মাচরণের সরাসরি বিরোধিতা বলে মনে করা হতো। প্লেটো ও এ্যারিস্টটল দুজনেই গ্রহ নক্ষত্রাদিকে ঐশ্বরিক আলৌকিক পদার্থ বলে মনে করতেন। মনে হয়, সক্রেটিসের বিচারকালে অর্থাৎ ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্ব সালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি এই বিরূপতার মনোভাব আরো তীব্র হয়েছিলো। কারণ সক্রেটিসের অপরাধ প্রমাণ করার জন্যে 'ক্লাউড্স্' নাটকটির কথা যে আবার উঠেছিলো তা সক্রেটিসের আত্মসমর্পণমূলক বক্তৃতাতেই দেখা যায়। অনেকে বলেন সক্রেটিসকে সোফিস্টদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হতো তার প্রমাণও 'ক্লাউড্স্'-এ আছে। সক্রেটিসকে এখানে একজন সোফিস্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে। বার্নেট অবশ্য একথাটা স্বীকার করেন না। কারণ তাঁর মতে, সোফিস্টদের ব্যক্তি হিসেবেই দেখানোর চল ছিল পুরনো মিলনান্তক নাটকে, নমুনা হিসেবে নয়।

এখন ধারণা করা যেতে পারে যে, জেনোফন 'ক্লাউড্স্' নাটক থেকে জেনে গিয়েছিলেন যৌবনের সক্রেটিসের প্রতি সাধারণ এথেন্সবাসীর কি রকম মনোভাব ছিলো। তাই তিনি তাঁর অপরাধ স্থালনের উৎসাহে 'মেমোরাবিলিয়া'য় বলেছিলেন সক্রেটিস প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি ভয়ানক বিমুখ ছিলেন অর্থাৎ কিনা তিনি অধার্মিক ছিলেন না। আমরা পরে আলোচনা করে দেখবো প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর যুবা বয়েসের উৎসাহ কেন অন্তর্হিত হয়েছিলো। কেউ পছন্দ করছে না বলে, এমন কি সমস্ত দেশবাসী পছন্দ করছে না বলে—তাই বা বলি কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী পছন্দ করছে না বলে—সক্রেটিস নিজে যা সত্য বলে জেনেছেন, তাকে পরিত্যাগ করবেন এমন মানুষ তিনি ছিলেন না। তাঁর সমান নির্ভীকহৃদয় মানুষ পৃথিবীতে হয়তো আরও জন্মেছে, কিন্তু তাঁর চেয়েও নির্ভীক কোনো মানুষের দেখা তো মেলে না। ইতিহাসের নির্ভীকতম যোদ্ধাও এই নিরীহ শস্ত্রহীন বৃদ্ধ সক্রেটিসের চেয়ে নির্ভীকতর নয়। কাজেই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের চর্চা ত্যাগ করার কারণগুলি সক্রেটিসের নিজেরই ছিলো।

এইবার প্লেটো প্রসঙ্গ। দেখা গেল, এ্যারিস্টোফেনিসের সক্রেটিস আর জেনোফনের সক্রেটিস এক ব্যক্তি নয়। দুজন যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। তাহলে বাস্তব, ইতিহাসসম্মত প্রকৃত সক্রেটিসকে কিভাবে পাওয়া যাবে ? প্রকৃত সক্রেটিসকে আর উদ্ধার করার আশা নেই বটে, তবে প্লেটো তাঁর 'ডায়ালগগুচ্ছ'-এ সক্রেটিসের যে চিত্র এঁকেছেন তা-ই হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে বিশদ, পুঙ্খানুপুঙ্খ, যথাযথ এবং সঙ্গতিপূর্ণ চিত্র। জেনোফনের সক্রেটিস ও এ্যারিস্টোফেনিসের সক্রেটিসকে প্লেটোর সক্রেটিসেরই ভাঙা ও বিকৃত প্রতিরূপ হিসেবে চিনে নেওয়া কঠিন নয়। এ্যারিস্টোফেনিস মূল সক্রেটিসকে ভেঙে বিকৃত করে এঁকেছিলেন প্রহসনের হাস্যকৌতুক সৃষ্টি করার জন্যে। শিল্পের খাতিরে তা হয়তো করা যায়। কিন্তু জেনোফন নানা কারণে সক্রেটিসের ব্যক্তিত্ব তুলে ধরতে পারেন নি। এর মধ্যে

প্রধান কারণ হচ্ছে সক্রেটিসের দোষ স্খালনটাকেই লেখার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির করা। অতএব এ্যারিস্টোফেনিস ও জেনোফন ছাড়া সক্রেটিসকে জানবার আর একটিমাত্র উৎস বাকি থাকছে। সে হলো প্লেটোর 'ডায়ালগগুচ্ছ'। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে সক্রেটিসের নামোল্লেখমাত্র প্লেটোর সক্রেটিসই আমাদের চোখে ভাসে। বিচিত্র অবস্থায় ও বিচিত্র পরিবেশে প্লেটো সক্রেটিসের ছবি এঁকেছেন। সক্রেটিসের মুখের কথা এবং বক্তৃতা এমনভাবে লিখেছেন যেন তিনি এইসব কথোপকথন সরাসরি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। একথা অবশ্য বলা যাবে না যে প্লেটোর সবগুলি ডায়ালগেই সক্রেটিসের প্রকৃত কথোপকথন পাওয়া যায়। উল্টোটাই বরং সত্যি। ডায়ালগগুলির কথোপকথন প্লেটো রচনা করেছিলেন। তবু অসম্ভব নয় যে সক্রেটিসের সঙ্গে অন্যদের প্রকৃত কথোপকথন প্লেটো তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন। ডায়ালগগুলিতে সক্রেটিসের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা যে সম্পূর্ণ বা প্রকৃত সক্রেটিসের অবিকল প্রতিরূপ এমন দাবি অবশ্য করা যায় না। সক্রেটিসের জীবনোৎসর্গ প্লেটোর কাছে এতই মহৎ একটি কার্য বলে মনে হয়েছিলো যে তাঁর রচনায়, তিনি এক মহিমময় বিরাট সক্রেটিস নির্মাণ করে থাকতে পারেন। কল্পনাসৃষ্ট এই সক্রেটিসের সঙ্গে প্রকৃত সক্রেটিসের পার্থক্য থাকা আদৌ বিচিত্র নয়। কারণ বিশাল ব্যক্তিত্ব সৃজনের কল্পনাশক্তি প্লেটোর ছিলো। তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় শিল্পী, বিরাট সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী। জেনোফনের যা ছিলো না—কল্পনা-শক্তি, সৃষ্টি-ক্ষমতা আর সংস্কারমুক্ত উদারতা—প্লেটোর ঠিক সেই জিনিসগুলিই ছিলো অঢেল পরিমাণে। অতএব জেনোফনের রচনায় যা ক্ষুদ্র হয়ে ধরা পড়ে প্লেটোর রচনায় তাই যে প্রকৃত আকারের চেয়ে বহুগুণে বৃহৎ হয়ে ধরা পড়বে এমন ভাবা অন্যায় নয়। এজন্যে অনেকে মনে করতে পারেন প্লেটোর বর্ণনায় সক্রেটিসের চরিত্র অতিরঞ্জিত হয়েছে। তিনি হয়তো এক কল্পনার সক্রেটিস তৈরি করেছেন। আরো মুশকিল হলো, প্লেটোর ডায়ালগগুলি নাটকের মতো কথোপকথনে ভরা, নানা চরিত্র সেখানে কথোপকথনে অংশ নিচ্ছে—কিন্তু বেশির ভাগ ডায়ালগে সক্রেটিসই প্রধান বক্তা। কথোপকথনের ভিতর দিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত হচ্ছে, যেভাবে তা আস্তে আস্তে জটিল হয়ে উঠছে, নানারকম চিন্তাভাবনার ছোটো স্রোত মিশে আলোচনার একটা বড়ো প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে—এর সবটাই নিয়ন্ত্রণ করছেন সক্রেটিস—লাটাই সব সময় তাঁরই হাতে। এই পদ্ধতিতেই প্লেটো ডায়ালগগুলি লিখেছেন। এমন কি প্লেটো যখন নিজের দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছেন, যাকে সক্রেটিসের নয়, প্লেটোর মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, তখনো প্লেটো তাঁর নিজের দার্শনিক মতবাদ সক্রেটিসের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন। অর্থাৎ প্লেটোর ডায়ালগগুলিতে সক্রেটিস যেমন নিজের জবানিতে নিজের দর্শন ব্যাখ্যা করছেন, ঠিক তেমনি প্লেটোর দর্শনও ব্যাখ্যা করছেন নিজের জবানিতে। অথচ পুরো জিনিসটা রচনা করেছেন প্লেটো। পরিস্থিতিটা অদ্ভুত। ডায়ালগগুলির মধ্যে নিজের এবং সক্রেটিসের মতবাদ প্রচারের জন্যে সক্রেটিসকে প্রধান প্রবক্তা হিসেবে দেখানোটাকে সক্রেটিসের প্রতি প্লেটোর অতুলনীয় গুরুভক্তির নিদর্শন বলে ভাবা যেতে পারে কিন্তু তাতে আসল সক্রেটিসকে

উদ্ধার করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মুশকিলটা আরো বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে এইজন্যে যে প্লেটো নৈর্ব্যক্তিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারেন। শিল্পী হিসেবে তিনি শেক্সপীয়রেরই সমতুল্য। নাটক রচনার বেলায় শেক্সপীয়র যেমন নিজেকে পুরোপুরি আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছেন, ডায়ালগগুলি রচনার সময় প্লেটোও ঠিক তেমনিভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখেছেন। সেইজন্যে কখন যে সক্রেটিস সক্রেটিস আর কখন যে সক্রেটিস প্লেটো সেটা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তবে ধরে নেওয়া হয় যে প্লেটোর প্রথমদিকের ডায়ালগগুলিতে আসল সক্রেটিসের চিত্র রয়েছে। প্লেটো যখন এই ডায়ালগুলি রচনা করেন, তখনো তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ গড়ে ওঠে নি এবং তিনি এগুলিতে প্রকৃত সক্রেটিসের চিন্তাধারাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমরা জানি সক্রেটিস কোনো কিছু লিখে রেখে যান নি, সেজন্যে বিশেষ করে, তাঁর দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে আমাদের পক্ষে প্লেটোর এই প্রথমদিকের ডায়ালগগুলির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। জেনোফন বা এ্যারিস্টোফেনিসের রচনা থেকে এ বিষয়ে তেমন কিছু মেলে না। অন্য উৎস আর কিছু নেই। আমরা এখন মেনে নিয়েছি যে সক্রেটিসের প্রধান প্রধান দার্শনিক বাক্য প্লেটোর প্রথম পর্যায়ের ডায়ালগগুলিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেজন্যে এটাও ধরে নিতে হয় যে, প্লেটোর প্রথম পর্যায়ের রচনাগুলিতে ব্যক্তি সক্রেটিসের খাঁটি বর্ণনা আছে। প্লেটোর সেরকম ডায়ালগ হচ্ছে 'এ্যাপোলজি', 'চারমাইডিস্', 'লাইসিস', 'ল্যাচেস' ইত্যাদি। 'এ্যাপোলজি' প্রসঙ্গে এর পরে আমাদের বার বার আসতে হবে। প্লেটোর এই একটি ডায়ালগকে প্রায় পুরোপুরি ঐতিহাসিক বলে ধরে নেয়া চলে। কারণ 'এ্যাপোলজি' হচ্ছে আদালতের সামনে অভিযুক্ত সক্রেটিসের আত্মসমর্থনমূলক ভাষণ। এরকম একটি ভাষণ তিনি সত্যই আদালতের সামনে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভাষণটি একেবারে আক্ষরিকভাবে, শব্দ থেকে শব্দে 'এ্যাপোলজি'তে স্থান পেয়েছে একথা হয়তো ঠিক নয়, তবে ভাষণটি এত জীবন্ত, এত আন্তরিক, এত অনমনীয় দৃঢ়তায় সংবদ্ধ এবং এমন অসাধারণ নির্ভীকতায় পরিপূর্ণ যে এটাকে সক্রেটিসের মুখনিঃসৃত বাক্যাবলি ভাবা মোটেই অসঙ্গত নয়। তাছাড়া এই একটিমাত্র ডায়ালগেই সক্রেটিসের ব্যক্তিত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্য ও সামগ্রিক চিত্র এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যে এখানেই আমরা রক্তমাংসের পুরো সক্রেটিসকে পেয়ে যাই। আরো উল্লেখযোগ্য যে, 'এ্যাপোলজি'তে যে সক্রেটিসের পরিচয় পাওয়া যায়—প্লেটোর সব ডায়ালগেই সেই একই নিরবচ্ছিন্ন সক্রেটিসকে দেখি। জেনোফনের মতো ছিন্নভিন্ন সক্রেটিস নয়। অসামান্য মৌলিক চিন্তাশক্তিসম্পন্ন প্লেটো তাঁর যুগান্তকারী সৃজন প্রতিভায় যে সক্রেটিসকে এঁকেছেন তাতে নানা বর্ণের প্রক্ষেপ পড়লেও একমাত্র তাঁর রচনাতেই সম্পূর্ণ সুবিন্যস্ত সঙ্গতিপূর্ণ আত্মবিরোধহীন সক্রেটিসকে পাওয়া যায়। এখন এই সক্রেটিস প্লেটোর গড়া কাল্পনিক সক্রেটিস হলেই বা কি করা যাবে ? তেমন কথা যে কেউ বলেন নি তাও নয়। কেউ কেউ বলেন, প্লেটোর সক্রেটিস, এ্যারিস্টোফেনিসের সক্রেটিস ও জেনোফনের সক্রেটিস—এই তিন সক্রেটিসই, ভুয়া—বিশুদ্ধ কল্পনার সৃষ্টি। বার্নেট লিখেছেন,

একজন গবেষক জানিয়েছেন তিনটি যুদ্ধাভিযানে সক্রেটিসকে অংশগ্রহণের গল্পের মধ্যে তিলমাত্র সত্য নেই এবং আল্‌কিবিয়াডিসের সঙ্গে তাঁর কোনো রকম সম্পর্ক ছিলো না। যুবক আল্‌কিবিয়াডিসের সঙ্গে সক্রেটিসের সম্পর্ক নিয়ে কদর্য গল্প ফেঁদেছিলেন পলিফ্রেটিস নামে একজন সোফিস্ট। আল্‌কিবিয়াডিস নাকি কখনোই সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন না। এই ধরনের তথ্য সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, সক্রেটিস সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে গেলে শেষ পর্যন্ত প্লেটোর সক্রেটিসকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে তাতেও সন্দেহ নেই। জেনোফনের সক্রেটিসকে টেকানো দুষ্কর। প্লেটো এবং জেনোফনের সক্রেটিসকে মিলিয়ে একটি সক্রেটিস দাঁড় করানোও কঠিন। প্লেটোর সক্রেটিস যদি কল্পনার সৃষ্টি হয়, তাহলে এটাও সত্য যে ইতিহাসে এতো বড়ো কল্পনা-সৃষ্ট চরিত্র বেশি নেই।

অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি সক্রেটিসের সমসাময়িক ছিলেন। এঁদের মধ্যে পেরিক্লিস (মৃত্যু ৪২৯ খ্রি. পূ.) ইস্কাইলাস (মৃত্যু ৪৫৬ খ্রি. পূ.), সফোক্লিস (মৃত্যু ৪০৬ খ্রি. পূ.) ইউরিপাইদিস (মৃত্যু ৪০৬ খ্রি. পূ.) প্রমুখের নাম করা যায়। কিন্তু সক্রেটিস সম্বন্ধে এঁদের কাছ থেকে কিছু জানা যায় না। অন্যদিকে এ্যারিস্টোফেনিস যখন 'ক্লাউড্‌স্‌' লেখেন তখন তাঁর বয়স একুশ বছর, সক্রেটিসের বয়স সাতচল্লিশ। বোঝাই যাচ্ছে যুবা বয়সের সক্রেটিসের প্রত্যক্ষ কোনো বিবরণ কোথাও নেই। প্রহসনের নিজস্ব প্রয়োজনে এ্যারিস্টোফেনিসের সক্রেটিস-চিত্রণ আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। জেনোফনের সীমাবদ্ধতা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তাছাড়া জেনোফন প্রৌঢ় সক্রেটিসের সংসর্গে এসেছিলেন অত্যল্পকালের জন্যে। তার তুলনায় প্লেটো সক্রেটিসের অনেক নিকট সম্পর্কে এসেছিলেন। প্লেটো যখন বিশ বছরের যুবক, তখন তিনি তাঁর নিজ গোষ্ঠীর একজন প্রভাবশালী আত্মীয় চারমাইডিসের মধ্যস্থতায় সক্রেটিসের সংস্পর্শে আসেন। সক্রেটিসের মৃত্যুকালে প্লেটোর বয়স আটাশ বা উনত্রিশ বছর। কাজেই বলা যায়, সক্রেটিসের সঙ্গে প্লেটোর সম্পর্ক সাত-আট বছর স্থায়ী হয়েছিলো। সক্রেটিসের বিচারকালে আদালতে অন্যদের সঙ্গে প্লেটোও উপস্থিত ছিলেন এবং সক্রেটিস তাঁর মৃত্যুদণ্ডের বদলে তিরিশ 'মিনি' জরিমানার যে প্রস্তাব করেছিলেন, সেটার জামিন হতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, যে দিক থেকেই হিসেব করা যাক না কেন প্লেটো অঙ্কিত সক্রেটিসের চিত্রই সবচেয়ে স্থায়ী হবে। সেই জন্যে পাঠকদের জানিয়ে রাখছি সক্রেটিস সম্বন্ধে এরপর যা কিছু লেখা হবে তার প্রায় সবই প্লেটো রচিত ডায়ালগগুলি থেকে সংগৃহীত। সক্রেটিস সম্বন্ধে যাঁরা লিখতে চান তাঁদের সকলের জন্যেই এই একটি পথ।

২

সক্রেটিসের সারাজীবনের কর্ম, তাঁর চিন্তা-ভাবনা, তাঁর দেয়া নৈতিক শিক্ষা—এককথায়, ইউরোপীয় সভ্যতার এই একজন প্রধান পুরুষকে জানতে গেলে যে-সমাজ তাঁর কর্মক্ষেত্রে ছিলো, সেই সমাজের একটা মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। সক্রেটিস সম্পূর্ণ সামাজিক মানুষ ছিলেন। মানুষমাত্রেই সামাজিক, সেটা বলার কোন দরকার নেই। একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক জীবন বলতে যা বোঝায়, সক্রেটিসের তেমন জীবনের কোনো চিত্র পাওয়া যায় না। তাঁর মনোনিবেশের মূল ক্ষেত্র হচ্ছে এথেনীয় সমাজ। আমরা যে সক্রেটিসকে দেখতে পাই, তিনি কখনো ঘরে থাকেন না, গৃহকর্মে তাঁর সময় কাটে না, কোনোরকম বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিমিষের জন্যে তাঁর মনোযোগ অধিকার করে না। তাঁকে আমরা প্রায় সবসময়েই গৃহের বাইরে দেখতে পাচ্ছি ; দেখতে পাচ্ছি এথেন্সের পথে-ঘাটে, বাজারে, সাধারণ মানুষের মধ্যে, সামাজিক অনুষ্ঠান উৎসবে। তাঁকে পরিবারের লোকজন বা জায়া পুত্রের সঙ্গে বড়ো একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এইসব কারণে সক্রেটিসকে সম্পূর্ণ সামাজিক মানুষ বলেছি। এবং ঠিক এই কারণেই বিমূর্ত দর্শনচিন্তা বলতে যা বোঝায়, সক্রেটিস তা কখনো করার চেষ্টা করেন নি। তাঁর জীবনের প্রায় সবটাই কাজ। তাঁর চিন্তাও এইদিক থেকে তাঁর কাজ। কারণ এথেনীয় সমাজক্ষেত্রে সরাসরি প্রয়োগসম্ভাবনা বাতিল করে তিনি কোনোকিছুই ভাবতে চান নি। সক্রেটিসের একটা বড়ো শিক্ষাই হলো জ্ঞান ও কর্ম এক অর্থাৎ জ্ঞান যদি কর্মে রূপান্তরিত না হয় তাহলে তাকে জ্ঞান বলাই যাবে না এবং যদি কর্ম জ্ঞান ব্যতিরেকে হতে থাকে, তাহলে তা অকর্ম বা দুষ্কর্ম। দার্শনিক বলতে যে আকাশচারী, স্বপ্নভুক, এলোমেলো, অপ্রস্তুত, বিপর্যস্ত, আধপাগলা মানুষের ধারণার চল আছে, অন্তত সক্রেটিস তার মূর্তিমান প্রতিবাদ। তবু এই অবাস্তব কল্পনাচারী দার্শনিকের ধারণা সক্রেটিসও হয়তো দিয়েছেন। তাঁর পোশাক ছিলো নোংরা এলোমেলো, চলাফেরা ছিলো হাস্যকর, আবার আচরণও হয়তো অন্যদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হতো না। কিন্তু এর সবটাই একেবারে বাইরের ব্যাপার। এথেনীয় সমাজের পুরোদস্তুর কাজে লাগাটাই তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা ছিলো।

আসলে এথেনীয় সমাজের কাঠামোর মধ্যেই সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একান্ত ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের জায়গা ছিলো না কোনো মানুষের জন্য।

ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে গেলে সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে সামাজিক কর্মের ভিতর দিয়েই তা করতে হতো।

এথেনীয় সমাজ থেকে আমরা আজ অনেক দূরে এসে পড়েছি। এত দূরে যে শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই সমাজের স্বরূপ আমাদের হয়তো অজানাই থেকে যাবে। তবু অন্য একদিক থেকে এথেনীয় সমাজ আমাদের কাছে খুবই পরিচিত বলে মনে হয়। তার কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্র ও সমাজসংক্রান্ত আজকের প্রায় সমস্ত ধারণাই আমরা এই গ্রীকদের কাছ থেকেই পেয়েছি। রাষ্ট্র ও সরকারের নানারকম শ্রেণীবিন্যাস, নাগরিকত্ব, গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, নির্বাচন, প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই রাষ্ট্রশাসনে অংশগ্রহণের অধিকার—এইসব মূল ধারণা হাজার রকমের গোঁজামিল সত্ত্বেও গ্রীকদের কাছ থেকেই সভ্য বিশ্ব পেয়েছে। কাজেই খুব সংক্ষেপে হলেও গ্রীস ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের একটা ধারণা পাওয়া দরকার। আমরা এখন একটু পেছনে তাকিয়ে দেখতে পারি।

গ্রীস নামটা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের। আজকের গ্রীস পরিচিত ছিলো 'হেলাজ' নামে। গ্রীক বোঝাতে এখনো 'হেলেনীয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কালের একজন গ্রীসবাসীকে 'হেলেনি' বলা চলে। হেলেনীয় জগৎ, হেলেনীয় সভ্যতা, হেলেনীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি শব্দবন্ধ এখনো বেশ চালু আছে। আদিতে 'হেলাজ' ছিলো থেসালির একটি জেলার নাম। পরে সমগ্র গ্রীস-ভূখণ্ড 'হেলাজ' নামে বিখ্যাত হয়।

মূল গ্রীস-ভূখণ্ডের পুরনো সভ্যতার নাম হচ্ছে মাইসেনিআন সভ্যতা। পূর্ব পেলোপনেসি-র আর্‌গস-এর সমভূমিতে মাইসেনিরা বাস করতো খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকে। মাইসেনিআন সভ্যতা স্থায়ী হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ৯০০ অব্দ পর্যন্ত। হোমারের 'ইলিয়াড' এবং 'অদিসি' নামের মহাকাব্য দুটিতে এই মাইসেনিআন সভ্যতার চিত্র আছে। ট্রয় অবরোধকারী আগামেমনন ছিলেন মাইসেনির রাজা।

বলাই বাহুল্য, মাইসেনিআন সভ্যতা স্বয়ম্ভূ নয়। ক্রীটীয় বা মাইনোআন সভ্যতা ধ্বংস হবার আগে মূল গ্রীস-ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে। এই সভ্যতাই নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অব্দি টিকে থাকে মাইসেনিআন সভ্যতা নামে। মাইনোআন সভ্যতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিলো মিশরীয় এবং মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার এবং সেইসূত্রে মোয়েন-জো-দারো ও হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গেও। গ্রীস-ভূখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ক্রীটের মাইনোআন সভ্যতা কিভাবে ধ্বংস হলো সেটা তেমন নিশ্চিত করে বলা যায় না। নসস্‌-এ অবস্থিত 'মাইনসের প্রাসাদ' এই সভ্যতার কেন্দ্র। মূলত সমুদ্র-বাণিজ্যকে অবলম্বন করেই এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। ক্রীটীয় বিশাল প্রাসাদগুলি সম্ভবত গ্রীস-ভূখণ্ডের দুর্ধর্ষ অভিযানকারীরা ধ্বংস করে দেয়। তবু এই সভ্যতা মাইসেনিআন সভ্যতার ভিতরে কিন্তু দীর্ঘদিন টিকে থাকে।

মাইসেনিআনরা কারা ? তারা কি গ্রীক ? তারা কি গ্রীক ভাষা বলতো ? এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া সহজ নয়। রাসেল লিখেছেন, 'গ্রীক বলে যারা পরিচিত তারা গ্রীসে আসে তিন তরঙ্গে।...প্রথমে আসে আইয়োনীয়রা—বিজয়ী হলেও তারা মাইসেনিআন সভ্যতা গ্রহণ করে।...পরে আসে আকীআনরা, তারা আইয়োনীয়দের বহুলাংশে উৎখাত করে।' ট্রয় অবরোধকারী গ্রীকদের হোমার আকীআন বলেছেন। আইয়োনীয় এবং আকীআনদের সংঘর্ষের ফলে মাইসেনিআন সভ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ তরঙ্গে ডোরিয়ান নামে যারা আসে তারা এই সভ্যতা একরকম ধ্বংস করে ফেলে। আইয়োনীয় ও মাকীআনরা আইনোআন ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিলো, ডোরিয়ানরা করে নি। তারা তাদের মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্ম ত্যাগ করে নি। মাইনোআন এবং মাইসেনিআন উভয় ধর্মই দেব-দেবীপ্রধান ছিলো।

মাইসেনিআন সভ্যতার শেষের দিকে গ্রীক অধিবাসীদের এক অংশ কৃষিভিত্তিক স্থায়ী বসতি স্থাপন করে, অন্যেরা আরো ছড়িয়ে পড়ে এবং এশিয়া মাইনরের দ্বীপগুলোতে, সিসিলি এবং দক্ষিণ ইতালিতে নগর পত্তন করে বসবাস শুরু করে। সামুদ্রিক বাণিজ্যই হয় এইসব নগরের সমৃদ্ধির মূল অবলম্বন। আমাদের মনে রাখতে হবে খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীস-ভূখণ্ডের ছোটো ছোটো নগরই মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে অভিনব এবং গুণগতভাবে মৌলিক অবদান রাখতে সমর্থ হয়। এথেন্সের প্রাধান্য পরের ঘটনা।

মূল গ্রীস-ভূখণ্ড পর্বতসঙ্কুল, দুর্গম ও অনুর্বর। ফলে নিরবচ্ছিন্ন বিশাল বিশাল জনপদ এখানে গড়ে উঠতে পারে নি। পাহাড় পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন অধিত্যকা উপত্যকায় কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী ছোটো ছোটো শহরকে কেন্দ্র করে বসবাস করতে শুরু করে। কারণ উপত্যকাগুলি উর্বর ও চাষোপযোগী, সমুদ্র হাতের কাছে থাকায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুবিধে ছিলো। যাই হোক, এইসব ছোটো শহরই আস্তে আস্তে নগররাষ্ট্রের রূপ নেয়। মূল গ্রীস-ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থল যোগাযোগের তেমন সুবিধে না থাকলেও সমুদ্র সংযোগ ভালো ছিলো। কারণ বেশির ভাগ নগরই সমুদ্রের কাছে গড়ে উঠেছিলো। গ্রীকরা কিন্তু এইসব নগরেই আটকা থাকে নি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এশিয়া মাইনর, সিসিলি, ইতালি ইত্যাদি জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো। সমুদ্র-বাণিজ্যের কল্যাণে এইসব কলোনি ধনসম্পদ প্রাচুর্যে মূল ভূখণ্ডের জনপদগুলিকে অতিক্রম করে গিয়েছিলো।

গ্রীকদের প্রামাণিক ইতিহাসের শুরু মোটামুটি ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে। একটু আগে যেমন বলা হয়েছে, হেলেনীয় জগৎ তখন পাহাড়ি অঞ্চলের নানা উপত্যকায় ছড়ানো-ছিটানো ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। জনগোষ্ঠীগুলি ছিলো রাজনৈতিকভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বাধীন। গ্রীক ভাষাটা সর্বত্র চলতো আর সমগ্র হেলেনীয় জগৎ বাঁধা ছিলো এক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে। বৃহৎ রাষ্ট্রিক ঐক্য গঠনের প্রচেষ্টা যে কখনোই ছিলো না, তা নয়। কিন্তু সে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যায় বড়ো মাছ ছোটো মাছ গিলে খাবার মতো এবং শেষ পর্যন্ত, বহু স্বতন্ত্র নগর-রাষ্ট্র এই এলাকায় গড়ে ওঠে। গ্রীকদের রাজনীতি সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প দর্শন সবই

এই নগর-রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে। নগর-রাষ্ট্রের ধারণাকে গ্রীক রাজনীতি এবং রাজনৈতিক আদর্শ কখনো অতিক্রম করে নি। সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল প্রত্যেকেরই ভাবনা-চিন্তা দর্শন নগর-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। নগর-রাষ্ট্রকে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন বলে বিবেচনা করতেন।

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলি সবই যে বিশেষ এক ধরনের সরকার দ্বারা শাসিত হতো তা নয়। তবে বেশির ভাগ নগর-রাষ্ট্রে কোনো না কোন এক ধরনের অভিজাততন্ত্র চালু ছিলো। আমরা যে সময়ের কথা বলছি—খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দ—তখন আর বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রচলিত নয়।

বংশানুক্রমিক পিতৃতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বর্ণনা হোমারের মহাকাব্যে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন হোমারের মহাকাব্য দুটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে সম্পূর্ণতা পায়। তা যদি হয় তাহলে হেলেনীয় ভূখণ্ডে রাজতন্ত্রের কাল মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো বলা চলে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে গ্রীস-ভূখণ্ডে সবচেয়ে প্রচলিত সরকারব্যবস্থা ছিলো অভিজাততন্ত্র। দেখা যাবে বেশির ভাগ নগর-রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাই ছিলো কোনো না কোনোভাবে অভিজাততান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকতো অল্প কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে। পরিবার এবং গোষ্ঠী-সম্পর্ক অভিজাততন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করতো নিশ্চয়ই। ধন নয়, অনেক সময় অভিজাততন্ত্র কয়েকটি পরিবার বা কতকগুলি গোষ্ঠীর প্রাধান্যমাত্র সূচিত করতো।

অভিজাততন্ত্রের পরেই দেখা দেয় স্বৈরতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্বৈরতন্ত্র অভিজাততন্ত্রকে পরাস্ত ও উৎখাত করে ফেলে। অভিজাততন্ত্রের দুঃশাসন, দুর্নীতি ও অন্তর্বিরোধ এমনিই চরমে ওঠে যে একে উৎখাত করার সংগ্রামে জনসাধারণই এগিয়ে আসে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন দেয়। অবশ্য এই জনসাধারণের আসল অংশটি হচ্ছে ব্যবসায়ী শ্রেণী। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলি ব্যবসাসূত্রে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিলো। নগর-রাষ্ট্রগুলির সমৃদ্ধি ও সমুদ্র-বাণিজ্যের প্রসার সমাজ কাঠামোর ভিতরে এবং মানুষের সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে এমন সব উপাদান এনে হাজির করলো যার ফলে পুরনো অভিজাততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তিটাই নড়বড়ে হয়ে গেল। অভিজাততন্ত্রকে উৎখাত করার উদ্যোগ গ্রহণ না করে আর কোনো উপায় থাকলো না নতুন গড়ে ওঠা বিরাট ব্যবসায়ী শ্রেণীটির পক্ষে।

সাতের শতকের শেষ পর্যন্ত এথেন্স একটি কৃষিভিত্তিক ছোটো রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছু ছিলো না। বংশানুক্রমিক রাজা বা স্বল্পসংখ্যক অভিজাতের হাতে যে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিলো তা কৃষিভিত্তিক স্থবির অর্থনীতিকে প্রাণপণ চেষ্টায় বজায় রাখারই চেষ্টা করেছিলো। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র আর সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি জিইয়ে রাখাই ছিলো অভিজাততন্ত্রের মূল লক্ষ্য। এইজন্যেই স্বৈরাচারীদের সহায়তায় অভিজাততন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী শ্রেণী ব্যগ্রতার সঙ্গেই এগিয়ে আসে। উদ্যোগী পুরুষসিংহের জন্যে সময়টা বড়ো অনুকূল ছিলো। খ্রিস্টপূর্ব

৫৬০ সালে স্বৈরাচারী পেইসিস্ট্রেটাস এথেন্সের ক্ষমতা দখল করেন। এই পেইসিস্ট্রেটাসই হোমারের মহাকাব্য দুটি বর্তমান আকারে এথেন্সে নিয়ে আসেন। এই শতকের মাঝামাঝিতে সাইরাস পারসিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সে যাই হোক, পেইসিস্ট্রেটাসের একনায়কতন্ত্রের অধীনে এথেন্স অতি দ্রুত কৃষিজীবী রাষ্ট্র থেকে বাণিজ্যিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মাউন্ট লরিয়াসে রুপো আবিষ্কৃত হওয়াতে এথেন্স তার বিখ্যাত মুদ্রা বানিয়ে ফেলে, কৃষিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে আঙুর আর অলিভের বিরাট কারবার গড়ে তোলে এবং অবিলম্বে একটি রপ্তানিকারী দেশে পরিণত হয়। কৃষ্ণসাগরের দেশগুলিতে প্রভূত মদ আর চর্বি সরবরাহ করে এথেন্স তার প্রয়োজনীয় শস্য সংগ্রহ করতেও সমর্থ হয়। করিন্থের সহযোগিতায় এথেন্স ভূমধ্যসাগরের সমস্ত নগরীতে নানারকম ভাণ্ড চালানের বিরাট কারবার গড়ে তোলে। অতএব, দেখা যাচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের আমলেই এথেন্সের সমাজপটের নতুন বিন্যাস দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়ে যায়। পরবর্তীকালে পেরিক্লিসের গণতান্ত্রিক এথেন্সের তুলনায় সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যেই নয় শুধু, শিল্প-সংস্কৃতির দিক থেকেও স্বৈরতান্ত্রিক এথেন্স খুব ন্যূন ছিলো বলে মনে হয় না।

কিন্তু তবু স্বৈরতান্ত্রিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারলো না। পেইসিস্ট্রেটাসের শাসনকাল মোটামুটিভাবে ৫৬০ থেকে ৫২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্বৈরাচারী হিপিয়াস খ্রিস্টপূর্ব ৫১০ সালে এথেন্স থেকে বহিষ্কৃত হন। এই ঘটনার দু এক বছরের মধ্যে এথেন্সে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। সক্রেটিসের জন্ম হয় ৪৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে সক্রেটিসের জন্মের চল্লিশ বছর আগে এথেন্সে স্বৈরতন্ত্রের অবসান হয়েছিলো এবং বিখ্যাত এথেনীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে গিয়েছিলো। সে গণতন্ত্র অবশ্য কি ধরনের ছিলো তা আমাদের আলোচনা থেকে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হবে আশা করি। আপাতত এইটুকু বলা যায় যে, এথেন্স ও গ্রীসের অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রের ইতিহাস যখন একটা বড়ো রকমের মোড় নেয়, তার কিছুকালের মধ্যে সক্রেটিসের আবির্ভাব ঘটে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বৈরতন্ত্রের আমলেই যখন এথেন্সের এতো সমৃদ্ধি, তখন স্বৈরতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হলো না কেন ? এর একটা কারণ পারসিক সাম্রাজ্যের উত্থান এবং আগ্রাসনের তৃষ্ণা। খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৫৪৬ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে বেবিলন, ঈজিপ্ট, ফোনোশিয়া, মিডিয়া এবং লিডিয়া পারসিক সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যাবার পর এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো যে পারসিকরা অদূর ভবিষ্যতে মূল গ্রীসখণ্ডে হাত বাড়াবে। পারসিক সাম্রাজ্যবিস্তারের ফলে ঈজিপ্টের বাজার এথেন্সের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল, কৃষ্ণসাগর এলাকাও হাতছাড়া হলো এবং উত্তর এজিয়ানের রুপোর খনিগুলিও আর ধরে রাখা গেল না। এই সঙ্কট সামলানো স্বৈরতন্ত্রের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

তবে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে ৫০৮-৯ খ্রিস্টপূর্ব সালে অপসারিত স্বৈরতন্ত্রের জায়গায় যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তাতে বিরাট একটা

বিপ্লব ঘটে গেল। স্বৈরতন্ত্রের যুগে এথেন্স যে বাণিজ্যিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়, গণতান্ত্রিক যুগে তা অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তার অর্থ হচ্ছে, যে ধরনের বাণিজ্যিক রাষ্ট্রে এথেন্সের রূপান্তর ঘটলো সে ধরনের রাষ্ট্র দক্ষতার সঙ্গে চালানোর জন্যে অভিজাততন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র কোনোটাই তেমন উপযোগী ছিল না। এথেনীয় ধরনের গণতন্ত্রই এজন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা ছিলো। গণতন্ত্র বলতে যাতে ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় এজন্যে এইখানে পাঠকদের মনে রাখতে বলছি যে এথেনীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি কিন্তু ছিলো দাস-শ্রম। সমস্ত উৎপাদনের কাজটা দাসদেরই করতে হতো এবং সে উৎপাদনে তাদের নিজেদের অংশ থাকা তো দূরের কথা, তাদের দেহ পর্যন্ত ছিলো দাস-মালিকের দখলে। এদিকে, এথেন্সে দাসদের সংখ্যা ছিলো মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। গণতান্ত্রিক অধিকারের তো প্রশ্নই নেই, এরা এমনকি নাগরিক বলেও গণ্য হতো না। বিদেশীরাও নাগরিক ছিলো না। কাজেই গণতন্ত্রসহ যে কোনো শাসনাধীনে দাস বা বিদেশীদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিলো না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এমন উৎকট বৈষম্য গণতান্ত্রিক এথেন্সবাসীদের কাছে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হতো। সক্রেটিস, প্লেটো বা এ্যারিস্টটল এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন নি। বরং এ্যারিস্টটল দাস-শ্রমভিত্তিক সমাজের পক্ষে চমৎকার দার্শনিক সাফাই গেয়েছিলেন। সে যাক, গণতান্ত্রিকব্যবস্থা ছাড়া এথেন্সের সঙ্কট নিরসনের যে আর কোনো পথ ছিলো না তা একটু আগে বলা হয়েছে। গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারসিকদের উপস্থিতির বিপদ, খাপছাড়া, অভিজাততান্ত্রিক সমররাষ্ট্রে স্পার্টার বিবর্তন, যুদ্ধ এবং বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয় এমন সাংঘাতিক জটিলতার সৃষ্টি করেছিলো যে স্বৈরাচারী একনায়কতান্ত্রিক শাসনকাঠামোয় এসব সমস্যা সমাধানের উপায় ছিলো না। বিপ্লবের কথাই যদি ওঠে, তাহলে বলতে হয়, বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছিলো অভিজাততন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বৈরাচারী শাসন যে সময় এথেন্সকে বাণিজ্যিক রাষ্ট্রে গড়ে তুলেছিলো সেই সময়। গণতন্ত্রের কালে ঠিক এই অর্থে বিপ্লব হয় নি। বরং স্বৈরাচারীরা যা করতে গিয়ে করতে পারে নি—অর্থাৎ বণিক, সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব নিরঙ্কুশ করা—সেই কাজটি করার দায়িত্ব গণতন্ত্র গ্রহণ করে। এই সময়ের গণতান্ত্রিক সংবিধানে বড়ো ভূস্বামীদের রাজনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্র বেশ সীমিত হয়ে যায়, তার বদলে বণিক, ব্যবসায়ী, কারিগর, শ্রমিক ও কর্মীদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা এসে জমে।

৫০৮-৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যে অভিজাত বাণিজ্যিক বংশটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা নিয়োছিলো, মাত্র দশ বছরের মধ্যে তার প্রভাব ক্ষয়ে আসে। সব রাষ্ট্রের জন্যেই অবাধ বাণিজ্যের অধিকার এবং পারসিক সাম্রাজ্যের ভীরু অধীনতা স্বীকারের যে নীতি এই বংশ গ্রহণ করেছিলো, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায় ৪৯৯ খ্রিস্টপূর্ব সালের দিকে এবং ঠিক এই সময়েই এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রথম দিকপাল নায়ক থেমিস্টোক্লিস ক্ষমতায় আসেন। তিনি রক্ষণশীল অভিজাততন্ত্রের অবাধ বাণিজ্যনীতি এবং পারসিক অধীনতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। পারসিকরা

প্রথম বড়ো ধরনের অভিযান চালায় ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ্যাটিকার পূর্বতটের সমভূমি ম্যারাথনে। গল্প আছে, এথেনীয় সংবাদবাহক ফিডিপ্পাইডিস পারসিকদের উপস্থিতির খবর এক বিরতিহীন দৌড়ে স্পার্টায় পৌঁছে দেন। তিনি নাকি দুদিনে ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। ম্যারাথন দৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই গল্প থেকেই চালু হয়েছে। ম্যারাথনের যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর পরাজয় ঘটলে এথেন্স একটি দুর্জয় নৌশক্তি গড়ে তুললো থেমিস্টোক্লিসের নেতৃত্বে এবং সর্বগ্রাসী একক বাণিজ্য বিস্তারে মন দিলো। এথেনীয় গণতন্ত্রের গৌরবকাল শুরু হয়ে গেল। পতনের বীজটাও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রোপিত হলো।

এথেনীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের এই সংক্ষিপ্ত পশ্চাৎপট চোখের সামনে রাখলে দেখা যাবে সক্রেটিস জন্মেছিলেন এথেন্সের গণতন্ত্রের গৌরবের কালে। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কেটেছিল পেরিক্লিসের এথেন্সে। পেরিক্লিসের শাসনকাল মোটামুটিভাবে ধরা হয় ৪৬১ থেকে ৪২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। কাজেই গণতান্ত্রিক যুগের এথেন্সের পূর্ণ সমৃদ্ধি সক্রেটিস দেখে গিয়েছিলেন বলা চলে। কিন্তু এথেন্সের সুদিনের অভিজ্ঞতাই শুধু পান নি, ঐ নগরের চরম সঙ্কটের ভয়াবহ দিনগুলিও তাঁকে পেরোতে হয়েছে। বলা যায়, সমগ্র গ্রীসে এবং তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় নগর এথেন্সে পৌনে এক শতাব্দীর কাছাকাছি কাল জুড়ে উত্থান-পতন, সমৃদ্ধি ও সঙ্কট, যুদ্ধ আর নিদারুণ পরাজয়, গণতান্ত্রিক আদর্শ আর চরম দুনীর্তিদুষ্ট ক্ষমতালোভের হানাহানি, হিংস্র আবেগপ্লাবিত জনগণের খামখেয়াল, পরাজয় আর ক্লেদে নিপতিত এথেন্স— এইসব মিলে যে মহানাটক চলেছিলো, সক্রেটিস ছিলেন তার দর্শক। সাধারণ দর্শক নন, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ক্ষুরধার বুদ্ধির অস্ত্রধারী আত্মসচেতন এক অসাধারণ দর্শক।

গ্রীসখণ্ডে এথেন্সের প্রাধান্যলাভ খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে। সক্রেটিসের জন্মের মাত্র দশ বছর আগে, খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সালে পারসিকরা গ্রীসে শেষ মরণ কামড়টি দেয়। ৪৮০ সালের যুদ্ধটিরই নাম থার্মোপাইলির যুদ্ধ। ঐ সালেই সালামিসের নৌযুদ্ধে পারসিকরা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হলো। বলতে গেলে এই বিজয়ের ভিতর দিয়েই এথেন্স গ্রীকজগতে প্রাধান্য অর্জন করলো। জলবাণিজ্যে তার আধিপত্য বাড়লো এবং ডেলিয়ন লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এথেন্স ধাপে ধাপে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্বের জায়গা দখল করে নিলো। নৌশক্তির জোরে এথেন্স যে আগ্রাসী বাণিজ্যবিস্তার করে তাকে গণতান্ত্রিক এথেন্সের সাম্রাজ্যবিস্তার বলেও বিবেচনা করা চলে। যদিও এই কালটি এথেন্সের অত্যুজ্জ্বল সমৃদ্ধি ও গৌরবের কাল বলে চিহ্নিত হয়েছে, তবু বলতে হয়, সমৃদ্ধির জন্যে এথেন্স যে উপায় বেছে নিয়েছিলো তার মধ্যেই লুকানো ছিলো তার ধ্বংসের কারণগুলি। আমরা জানি, এথেন্সের বাণিজ্যক্ষুধা শেষ পর্যন্ত রাজ্যক্ষুধার রূপ নিয়েছিলো। ডেলিয়ন লীগভুক্ত নগর-রাষ্ট্রগুলি এথেন্সের বাণিজ্য স্বার্থে নিজেদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে বাধ্য হচ্ছিলো। গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অসন্তোষ খুব বেশি দিন আর চাপা থাকলো না। স্পার্টা দৃঢ়ভাবে এথেন্সের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। এর কিছুদিন পরেই ৪৩১

খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হলো পেলোপনেসীয় যুদ্ধ। সক্রেটিসের বয়স তখন প্রায় চল্লিশ বছর। যুদ্ধ শুরু হবার দুবছরের মধ্যে ৪২৯ খ্রিস্টপূর্ব সালে পেরিক্লিসের মৃত্যু ঘটলো। দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, নিরবচ্ছিন্ন পেলোপনেসীয় যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল প্রায় তিরিশ বছর। ৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন এথেন্সের পরাজয়ের মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ হয়, তখন তার সমস্ত শক্তি অপচিত। হাহাকারপূর্ণ এথেন্সের বাতাসেও সক্রেটিসকে নিঃশ্বাস নিতে হয়েছিলো। একদিক থেকে এটাকে সক্রেটিসের দুর্লভ ভাগ্য বলতে হবে যে তিনি তাঁর আপন রাষ্ট্রের গৌরব আর সমৃদ্ধি এবং তৎপরবর্তী দুঃসহ অধঃপতন ও ক্ষয় স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন।

একটা কথা এখানে বলে রাখি। গ্রীকদের কাছ থেকে আমরা রাজনীতি, দর্শন, নীতি ও নন্দনতত্ত্বের প্রায় সমস্ত মৌলিক ধারণা পেয়েছি এবং এখনো অল্পবিস্তর সে সব লালন করছি বটে কিন্তু এইসব ধারণার মূল অর্থ গ্রীকদের কাছে যা ছিলো আমাদের কাছে তা আর আদৌ নেই। অথচ কিভাবে যেন এখনো এইসব ধারণার অর্থ মোটামুটি একই থেকে গেছে। যে এথেনীয় গণতন্ত্রের কথা বার বার বলা হচ্ছে, সেই গণতন্ত্র বলতে এথেন্সবাসীরা যা বুঝতো এবং যে গণতন্ত্র তারা চালু করেছিলো, তার সঙ্গে আজকের গণতন্ত্রের অনতিক্রম্য পার্থক্য আছে। কথাটা একটু যদি না বলা হয়, তাহলে সক্রেটিসের কালের গণতান্ত্রিক এথেন্স সম্বন্ধে ভালো ধারণা করতে পারা যাবে না এবং সক্রেটিসের সমর্থনের বা বিরোধিতার বিষয়গুলির যুক্তিও ঠিকমতো বুঝতে পারা যাবে না। সক্রেটিস গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন এবং একধরনের অভিজাততন্ত্রের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করেছিলেন, শুধুমাত্র এই কথা বললে সক্রেটিসের প্রতি অসম্ভব অবিচার করা হয়। শুধু তাই নয়, তাতে সক্রেটিস বা তাঁর কাল ও সমাজকে কিছুমাত্র বোঝাও যায় না। এই কাথাটা খেয়াল করা দরকার।

আমাদের প্রথম মনে রাখতে হবে এ্যাটিকা রাজ্য (এথেন্স এবং তার আশপাশের অঞ্চল) আয়তনের দিক থেকে খুবই ছোটো ছিল। স্যাবাইন লিখেছেন, 'এ্যাটিকার আয়তন রোড আইল্যান্ডের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি ছিলো। লোকসংখ্যার দিক থেকে এথেন্স ছিল ডেনভার বা রচেস্টার-এর সঙ্গে তুলনীয়। নগর-রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যা খুবই অনিশ্চিত, তবে মোটামুটি তিন লক্ষের কাছাকাছি ধরাটাই ঠিক হবে।'

এথেন্সের জনসংখ্যাও যদি এই রকম ধরা যায়, তাহলে মনে রাখা দরকার যে এই তিন লক্ষ মানুষের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ এক লক্ষ ছিলো দাস। সরকার গণতান্ত্রিক হোক, অভিজাততান্ত্রিক হোক বা স্বৈরতান্ত্রিক হোক, তাতে এদের জন্যে কিছুই হেরফের হচ্ছে না। কারণ তাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিলো না, যেমন নেই আমাদের একালের গৃহপালিত পশুদের। এরা নাগরিক বলেই গণ্য নয়। দাস-সমাজ তখন সর্বজনস্বীকৃত সমাজ। 'মজুরি প্রথা যেমন আধুনিক কালের, দাস-প্রথা তেমনি নগর-রাষ্ট্রিক অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিলো। কাজেই সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল কারোরই রাষ্ট্রতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনায় দাসরা রাজনৈতিকভাবে

গণ্য হয় নি। এছাড়া ছিলো বিরাট একটি বিদেশী জনগোষ্ঠী। এরা এথেন্সের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু এরাও নাগরিক নয় এবং সেজন্যে এদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। একমাত্র এথেনীয় পিতামাতার সন্তানই এথেনীয় নাগরিক। গ্রীকদের কাছে নাগরিকত্ব একটা খুব বড়ো ব্যাপার—জন্মসূত্রে পাওয়া বিশেষ অধিকার—সেটা নিজে নিজে অর্জন করার রাস্তা ছিলো না।

দাস এবং বিদেশীদের বাদ দিয়ে যারা থাকলো (মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশি) একমাত্র তারাই হচ্ছে নাগরিক। এথেনীয় গণতন্ত্রের মূল কথাটা হলো রাষ্ট্র পরিচালনায় এই নাগরিকদের সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হবে। সরাসরি অংশগ্রহণের অর্থ হয়তো নগরের সাধারণ সভায় যোগদানের অধিকারের বেশি আর কিছু নয়। স্যাবাইন লিখেছেন :

> একজন গ্রীকবাসীর জন্যে নাগরিকত্বের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো-না-কোনোভাবে অংশগ্রহণ। অল্প বা বেশি। অতএব নাগরিকত্বের আধুনিক ধারার চেয়ে গ্রীক নাগরিকত্বের ধারণাটা অনেক বেশি অন্তরঙ্গ—গ্রীকরা নাগরিকত্বকে অর্জিত সম্পদ না ভেবে এমন একটা জিনিস ভাবতে অভ্যস্ত ছিলো যা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়া যায়—অনেকটা পরিবারের সদস্যেরা যেমন করে।

এইবার এথেন্সের গণতন্ত্রের কাঠামোটা দেখা যায়। একটু আগে যাদের নাগরিক বলা হলো অর্থাৎ দাস ও বিদেশীদের বাদ দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক (বিশ বছরে পৌঁছুলেই প্রাপ্তবয়স্ক ধরা হতো) সমস্ত পুরুষ—এদের নিয়ে গঠিত হতো এ্যাসেম্বলি বা ইক্লেসিয়া। এ্যাসেম্বলি সাধারণত বছরে দশবার অধিবেশনে মিলিত হতো। আইন-কানুন সব এখানেই সমস্ত জনসাধারণের দ্বারা প্রণীত হতো। তবু এটাকেই গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। এ্যাসেম্বলিতে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বসলেই যে রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। গ্রীসে গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ইত্যাদি সব সরকারেই অল্পবিস্তর জনগণের মিলিত হবার ব্যবস্থা ছিলো। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি যে সেখানেই নির্ধারিত হতো একথা বলা যায় না। স্যাবাইন লিখেছেন, সমস্ত নাগরিকের এ্যাসেম্বলি খুব বড়ো কথা নয়, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্য কর্মকর্তাদের সমগ্র নাগরিকমণ্ডলীর কাছে দায়ী করবার এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার যে রাজনৈতিক পদ্ধতি বের করা হয়েছিলো সেটাই গুরুত্বপুর্ণ। এই উদ্দেশে নাগরিকদের সমস্ত স্তর থেকে প্রতিনিধি নিয়ে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিশাল একটি পরিষদ গঠন করা হতো। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এই পরিষদের উপর দায়িত্ব থাকতো সমগ্র জনগণের নামে কর্মপরিচালনা করার। সাধারণভাবে কারোর জন্যেই দ্বিতীয়বার নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকায় এটা ধরে নেয়া হতো যে এথেন্সের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক অন্ততপক্ষে একবারের জন্যে এই পরিষদে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবে। এথেন্সে এই পরিষদের নাম ছিলো 'পাঁচশতের পরিষদ' (কাউন্সিল অব ফাইভ হান্ড্রেড) কাজের সুবিধের জন্য এথেন্সের দশটি প্রধান গোষ্ঠীর নাগরিকদের মোট একশোটি 'ডেমি'তে ভাগ করা হয়েছিলো।

জায়গার অভাবে আমরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনায় যেতে পারছি না। তাছাড়া আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হবে। তা হলো এথেন্সের বিচার ব্যবস্থা। নিঃসন্দেহে এথেনীয় বিচার ব্যবস্থাই হচ্ছে সমগ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চাবিকাঠি। 'আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে এর কোনো তুলনা চলে না।' দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলার রায় দেয়া ছাড়াও এথেনীয় আদালত এমন কাজও করতো যাকে আজকের দৃষ্টিতে আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগের কাজ বলা চলে। মোট একশো 'ডেমি' থেকে মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচকের মাধ্যমে এক বছরের জন্যে ছ'হাজার লোকের একটি করে তালিকা প্রস্তুত হতো। এদের মধ্য থেকে বিশেষ মামলার নিষ্পত্তির জন্যে লটারি করে লোক বেছে নেয়া হতো। তিরিশ বছর বয়সে পৌঁছুবার পর যে কোনো এথেনীয় নাগরিক বিচারক হিসেবে মনোনীত হতে পারতো। এথেনীয় আদালতকে গণ-আদালত বলা যেতে পারে। বিচারক ও জুরিদের সংখ্যা কদাচিৎ ২০১ জনের কম হতো, ৫০১ জনই ছিলো সবচেয়ে প্রচলিত সংখ্যা, কখনো কখনো তারও বেশি হতো কোনো একটিমাত্র মামলার নিষ্পত্তি করার জন্যে। অভিযোগকারীদের ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে আদালতের সামনে অভিযোগ জানাতে হতো। অভিযোগ জানানো হয়ে গেলে অভিযুক্ত দোষী কি নির্দোষ এই নিয়ে জুরিদের ভোটগ্রহণ করা হতো। দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তির প্রস্তাব আনতো অভিযোগকারীরাই। অভিযুক্ত ব্যক্তি করতো পাল্টা শাস্তির প্রস্তাব। তখন আবার জুরিদের ভোটগ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। এথেনীয় আদালতের রায় ছিলো চূড়ান্ত, তার বিরুদ্ধে আর কোনো আপীল ছিলো না। কারণ ধরে নেয়া হতো আদালত সমগ্র জনসাধারণের নামে বিচার বসেছে। অতএব, আদালতের রায় হলো সমগ্র জনগণের রায়। তার বিরুদ্ধে আর আপীল চলে না।

এথেনীয় গণতন্ত্রের কাঠামো এবং তার সমাজের চেহারা সম্বন্ধে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা এই কারণেই করা হলো যে, এখন আমরা হয়তো সক্রেটিসকে এই প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তাঁর ভাবনা-চিন্তা, কর্ম, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি আর একটু ভালো করে বুঝতে পারবো।

৩

পেলোপনেসীয় যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সক্রেটিস সাধারণ এথেনীয় নাগরিকের জীবনই কাটিয়েছেন। কোনোভাবে তাঁর আচরণ যে কাউকে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে বা তাঁর কাজকর্ম, মতামত ও চিন্তাধারা এথেনীয় সমাজের মধ্যে প্রবলভাবে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি জেনেছেন অনেক, ভেবেছেন অনেক, নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁর কালের প্রধান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছেন, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—কিন্তু তাঁর জীবনের কাজ শুরু করেন নি। যে সক্রেটিস এথেন্স নগরের জীবনে সূর্যের মতো প্রখর দীপ্তিতে জ্বলেছেন, যাঁকে ছাড়া অনেকের বেঁচে থাকা নিরর্থক বলে মনে হয়েছিল এবং যাঁর মৃত্যু ছাড়া কিছু লোক আর কোনো কিছুই কামনা করে নি, সেই সক্রেটিস আসলে মধ্যবয়স অতিক্রান্ত প্রৌঢ় সক্রেটিস। যৌবনের সক্রেটিসের উৎকট আপোসহীন ইস্পাত-কঠিন ব্যক্তিত্বের খবর আমাদের জানা নেই।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের দিকে সক্রেটিসের জীবন একটা নতুন দিকে মোড় নেয়। সে কথা আমরা একটু পরে আলোচনা করবো। এখন আমরা বরং সক্রেটিসের দু-একটি বিশেষত্ব উল্লেখ করি।

সক্রেটিস মোটেই প্রিয়দর্শন ব্যক্তি ছিলেন না। বেঁটে, মোটা, গড়নহীন, থ্যাবড়া নাক, উঁচু-কপালে, ড্যাবডেবে চোখ-ওলা একটি মানুষ ছিলেন সক্রেটিস। কথা বলার সময় তাঁর ড্যাবডেবে ট্যারা চোখ দুটো ঘুরতে থাকতো। অদ্ভুত হাঁটার ভঙ্গি ছিলো তাঁর। হাঁসজাতীয় জলচর পাখির মতো এমন দুলে দুলে তিনি চলাফেরা করতেন যে তা দেখে হাস্য রোধ করা কঠিন হতো। কোথাও তাঁকে টর্পেডো মাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে তিনি দেখতে ছিলেন সাইলেনসের মতো। সাইলেনস হচ্ছেন গ্রীক পুরাণের প্রাচীন দেবতা বাক্কাসের পালক পিতা। সাইলেনস্‌কে সাধারণত দেখানো হতো মোটা, আ-গড়া, হাসিখুশি, মাতাল বুড়ো হিসেবে।

আর একটি ব্যাপার তাঁর বাল্যকাল থেকেই লোকের জানা ছিলো। তিনি নাকি একটি 'কণ্ঠস্বর' শুনতে পেতেন। সক্রেটিস বলতেন এটা তাঁর কাছে 'দৈব সংকেত'। তিনি সত্যিকার কণ্ঠ শুনতে পেতেন, না কোনো একটা সংকেত পেতেন সেটা তেমন পরিষ্কার নয়। তবে সক্রেটিস এটাকে অনন্য ব্যাপার বলে মনে

করতেন, ভাবতেন এই দৈব সংকেত একমাত্র তিনিই পান। সংকেত তিনি যখন তখন পেতেন। মজার কথা হচ্ছে এই 'কণ্ঠস্বর' বা 'সঙ্কেত' তাঁকে কোনো কিছু করার জন্যে প্ররোচিত করতো না, বরং কোনো কোনো কাজ করা থেকে তাঁকে বিরত রাখতো। তার মানে, এই কণ্ঠস্বর নিষেধসূচক। সক্রেটিসের যেমন অসাধারণ রসিকতাবোধ ছিলো তাতে এই পুরো ব্যাপারটাই তাঁর সারা জীবনব্যাপী রসিকতা কিনা কে বলবে ? তবে এটা ঠিক যে প্রথম জীবনে তিনি ধর্মতত্ত্বের দিকে বেশ ঝুঁকেছিলেন এবং আত্মা ও অমরতায় সমস্ত জীবনে বিশ্বাস রেখে গেছেন। আর একটি মজার কথা এখানে উল্লেখ করি। মাঝে মাঝে সক্রেটিসের 'পুলক-মূর্চ্ছা' বা 'ভাবাবেশ' দেখা দিতো। গভীর চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব সক্রেটিসের এই অভ্যেস বা ভাবাবেশের ব্যাপারটি জানতেন। সেজন্যে যখনই এরকম অবস্থা দেখা দিতো, বিরক্ত না করে তাঁরা তাকে একা ফেলেই চলে যেতেন। সক্রেটিস পোটেইডিস শিবিরে থাকার সময় এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। তখনো তাঁর বয়স চল্লিশ হয় নি। ঘটনার বিবরণ 'সিম্পোজিয়াম'-এ এইভাবে দেওয়া আছে :

> একদিন সকালে তিনি কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করছিলেন, কিন্তু সমাধান পাননি। ছাড়বার পাত্র নন তিনি, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চিন্তা করলেন একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। দুপুরে একবার তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হলো, তারপর আশপাশের কৌতূহলী লোকজনের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে সক্রেটিস ভোরবেলা থেকে কিছু একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। শেষে সন্ধ্যেবেলায়, রাতের খাওয়ার পর একদল আইয়োনীয় কৌতূহলপরবশ হয়ে (আমার বলা উচিত যে ঘটনাটা ঘটেছিলো শীতকালে নয়, গ্রীষ্মকালে) বিছানা মাদুর নিয়ে এসে খোলা আকাশের তলায় শুয়ে পড়লো যাতে তারা সক্রেটিসের ওপর নজর রাখতে পারে আর দেখতে পারে সত্যিই তিনি সারারাত দাঁড়িয়ে থাকেন কিনা।
>
> সত্যিই পরদিন সকাল পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন ; তারপর প্রত্যূষের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের প্রতি একটি প্রার্থনা নিবেদন করে নিজের কাজে চলে গেলেন।

এইরকম ঘটনা কিছু আরও ঘটেছিলো। ঐ 'সিম্পোজিয়াম'-এই আছে সক্রেটিস এবং এ্যারিস্টোডেমাস এক ভোজসভায় যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথের মধ্যে সক্রেটিসের 'ধ্যানমূর্চ্ছা' হলো। এ্যারিস্টোডেমাস ভোজবাড়িতে পৌঁছুলে গৃহকর্তা তাঁকে সক্রেটিসের কথা জিজ্ঞেস করলেন। এ্যারিস্টোডেমাস তো সক্রেটিসকে দেখতে না পেয়ে অবাক! একজন ক্রীতদাস পাঠানো হলো তাঁর খোঁজে। কিছুক্ষণ পরে সে এসে খবর দিলো যে এক প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে সক্রেটিস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, শত ডাকাডাকিতেও কান দিচ্ছেন না।

সক্রেটিসের এই 'কণ্ঠস্বর' বা ধ্যানস্থ হবার ব্যাপার তাঁর যৌবনকালে এথেন্সবাসীদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে থাকতে পারে ; এই কারণে তিনি হয়তো

খানিকটা পরিচিতিও পেয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু এগুলি তেমন বড়ো ব্যাপার নিশ্চয়ই ছিলো না। বড়ো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় পরে—তাঁর বিচারের সময়। তাঁর বিরুদ্ধে এথেনীয় দেব-দেবী অস্বীকার, নতুন ধর্মমত প্রবর্তন ইত্যাদি যে অভিযোগ উঠেছিলো তার সঙ্গে সক্রেটিসের 'দৈব কণ্ঠস্বর'-এর যোগাযোগ সহজেই ঘটে যায়।

এইবার সক্রেটিসের যৌবনের অধ্যয়ন ও জ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 'এ্যাপোলজি'র এক জায়গায় সক্রেটিস বলেছেন যে তিনি বিজ্ঞানের লোক নন, বলেছেন 'প্রকৃতি সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা নিয়ে আমার কিছু করার নেই।' এ থেকে একটা ধারণা হয় যে সক্রেটিস প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন। জেনোফনও এইরকম ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। তার অর্থ, সক্রেটিস আইয়োনীয়, ইলীয়, পিথাগোরীয় বিজ্ঞান বা এম্‌পিডকলিস ও ডেমোক্রিটাসের জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর রাখতেন না অথবা রাখলেও এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। একথা অবশ্য সত্য যে পরবর্তীকালে সক্রেটিস প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চায় কালক্ষেপণ নিরর্থক জ্ঞান করেছিলেন। কিন্তু একথাটা আদৌ সত্য নয় যে, সক্রেটিস তাঁর কালের প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেন নি। যৌবনে সক্রেটিস তাঁর সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অণুপুঙ্খ খবর রাখতেন এবং সাগ্রহে তার চর্চাও করতেন। প্লেটোর 'ফিডো' ডায়ালগে সক্রেটিস নিজের বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের একটা বর্ণনা দিয়েছেন। যেসব প্রসঙ্গ তিনি উল্লেখ করছেন, সেসব প্রসঙ্গ সক্রেটিসের যৌবনকালের এথেন্সেই তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো, পরবর্তীকালে নয়। যেমন তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন এই প্রশ্ন নিয়ে যে জীবন কি তাপ ও শৈত্যের শটনক্রিয়া থেকে উদ্ভূত (আর্চেলসের তত্ত্ব) অথবা পৃথিবী চ্যাপ্টা (আইয়োনীয়দের তত্ত্ব) না গোলাকার (পিথাগোরীয়দের তত্ত্ব) ইত্যাদি ইত্যাদি।

এছাড়া দেখা যাবে যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন ইলীয় দার্শনিক জেনো এবং পারমিনাইডিস এথেন্স আসেন, সক্রেটিস তাঁদের সঙ্গে তাঁর নতুন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। প্লেটোর 'পারমিনাইডিস' নামের ডায়ালগে পারমিনাই-ডিসকে সক্রেটিসের প্রশংসা করতে দেখা যায়। প্লেটো যা বোঝাতে চান তা এই যে অনূর্ধ্ব পঁচিশ বছর বয়সেই সক্রেটিস তাঁর কালের সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এখন এটা আর কোনো বিতর্কের বিষয় নয় যে, সক্রেটিস তাঁর বিখ্যাত 'ডায়ালেকটিক পদ্ধতি' ইলীয় দার্শনিক জেনোর কাছ থেকে পান। এ্যারিস্টটল জেনোকে 'ডায়ালেকটিক পদ্ধতি'র প্রকৃত আবিষ্কর্তা বলেছেন। 'ডায়ালেকটিক পদ্ধতি' হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা। 'ডায়ালেকটিক' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কথোপকথন-কলা। এই পদ্ধতি বিশেষ নিয়মকানুন দিয়ে বাঁধা ছিলো। প্রশ্নের জবাব দিতে হতো স্বল্পতম কথায়, যা প্রশ্ন করা হতো একমাত্র তারই জবাব দিতে হতো—বাড়তি কথা বলা চলতো না। তত্ত্ব আলোচনার জন্যে এই পদ্ধতিটি সক্রেটিসের খুবই পছন্দ হয়। পরবর্তীকালে এই 'ডায়ালেকটিক পদ্ধতি' 'সক্রেটীয় পদ্ধতি' নামে বিখ্যাত হয়েছে। সক্রেটিসের হাতে এই পদ্ধতি মারাত্মক হাতিয়ার হিসেবে দেখা দেয়। প্রশ্নোত্তরের ফাঁদে জড়িয়ে বহু পণ্ডিতম্মন্য

ব্যক্তি সক্রেটিসের কাছে নাকালের হদ্দ হয়েছিলেন। যে কোনো একটি বিষয় আলোচনার জন্যে বেছে নিয়ে সক্রেটিস সরাসরি স্বীকার করতেন যে ঐ বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র জ্ঞান রাখেন না। যাঁর বা যাঁদের সঙ্গে তিনি আলোচানয় বসতেন, তাঁদের কাছে নিজের অজ্ঞানতা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করার পরেই শুরু হতো কথোপকথন বা প্রশ্নোত্তরের তলোয়ার খেলা। অজ্ঞানতা থেকে সক্রেটিস প্রশ্ন করতেন, জবাব পেলে খুশি হতেন এবং তার পরই যে উত্তরটা পেতেন সেটা সম্পর্কে সামান্য দ্বিধা প্রকাশ করতেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়তো যে উত্তরকারী বা উত্তরকারীরা নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের যে দাবি করছেন, সে দাবি নিতান্তই অসার। সক্রেটিসের মতোই উত্তরকারীরাও অজ্ঞানতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছেন। জ্ঞানের অহঙ্কার ছিলো যাঁদের, তাঁদের এইরকম নাকাল হতে নিশ্চয়ই ভালো লাগতো না। সক্রেটিসের ডায়ালেকটিক পদ্ধতির ক্ষুরধার অস্ত্রের স্বাদ যাঁরা পেয়েছিলেন, এথেন্সের তেমন বহু জ্ঞানী গুণী যে সক্রেটিসের উপর হাড়ে হাড়ে চটেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

আপাত-নিরীহ অজ্ঞানতার আঁকশি দিয়ে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের আলোচনায় টেনে আনা, তারপর তাঁদের জ্ঞানের অহঙ্কারের আবরণটিকে একটু একটু করে খসিয়ে ফেলা—এই পুরো ব্যাপারটির মধ্যে যে চাপা নিষ্ঠুর রসিকতা আছে, তাই পরে 'সক্রেটীয়' শ্লেষ নামে খ্যাত হয়েছে। সক্রেটিসের সমালোচকেরা তাঁকে শেয়ালের মতো ধূর্ত বলেছেন। বিরোধীপক্ষীয়রা যে তাঁর বিরুদ্ধে 'আয়রোনি' বা 'শ্লেষ'-এর অভিযোগ আনতো, তার কারণ সক্রেটিসকে তাদের অহঙ্কারী বলে মনে হতো। কিন্তু এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে সত্যানুসন্ধানে সক্রেটিস কখনোই কোনো রকম ঠাঁটের আশ্রয় নেন নি। বার্নেট লিখেছেন : 'যেটুকু পরিষ্কারভাবে দেখতে পেতেন, তার বাইরে কোনো কিছুই তিনি মেনে নিতে পছন্দ করতেন না এবং নিজের ও অপরের (জ্ঞান অর্জনের) ক্ষমতাকে খাটো করে দেখার একটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিলো। এটা তাঁর ভড়ং ছিলো না ; যা কিছু বাগাড়ম্বরস্ফীত এবং অনান্তরিক তার সংস্পর্শে এলেই তিনি সহজভাবেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। তবে এটাও ঠিক যে, 'সক্রেটিয় শ্লেষ' আসলে তাঁর অতি তীব্র রসবোধ ছাড়া আর কিছু ছিলো না। প্রতিটি বস্তুকে তিনি যথাস্থানে স্থাপন করেই দেখতে পারতেন।'

সক্রেটিস যে যৌবনে বিশ্বতত্ত্ব ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছিলেন, খুব যত্ন করে থেলিস থেকে এন্যাক্সগোরাস পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব আয়ত্ত করেছিলেন, সেকথা ইতোমধ্যে কয়েকবার বলা হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে পরবর্তীকালে তিনি বিশ্বতত্ত্বের প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু আসল কথা হলো, প্রকৃতি-বিজ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার ঘটনাও তাঁর অল্প বয়সেই ঘটে। বার্নেট লিখেছেন : তিনি যা জানতে চাইতেন তার উপর এইসব তত্ত্বের কোনোটাই আলো ফেলতো না। তিনি জানতে চাইতেন বস্তুরাশির কারণ, কেন বস্তুরাশি যেমন আছে তেমনি বা কেন তারা যে পরিণতি লাভ করে, সেই পরিণতিই লাভ করে ?'

প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি এইসব প্রশ্নের জবাব এত যান্ত্রিকভাবে দিতো যে সক্রেটিস তা গ্রহণ করতে পারতেন না। তাঁর মতে এ ধরনের মতবাদকে মেনে নেবার কোনো কারণ নেই। বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে আইয়োনীয় মতবাদ সত্য কিনা যাচাই করবার জন্যে কখনো কোনো সাক্ষী উপস্থিত ছিলো না। কাজেই বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-প্রমাণ এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আরও কথা আছে। পৃথিবীর সৃষ্টিবিষয়ক যে কোনো মতবাদকে মনগড়া ও কল্পনার তৈরি বলে বাতিল করা যায়। কারণ এই বিষয়ক কোনো মতবাদই বুদ্ধিগম্য নয় অর্থাৎ মানুষের যুক্তিকে তা কখনোই সন্তুষ্ট করতে পারে না। অন্য কথায়, মানুষের বুদ্ধিনির্মিত কোনো যুক্তিজাল থেকেই এধরনের কোনো মতবাদ সিদ্ধান্ত হিসেবে নির্গত হতে পারে না। দুই আর দুইয়ের যোগফল যে চার একথা বুদ্ধিগম্য, কিন্তু পৃথিবী আগুন থেকে সৃষ্টি হয়েছে, বা জল থেকে তৈরি হয়েছে অথবা পৃথিবীর উদ্ভব সংখ্যা থেকে ইত্যাদি কোনো তত্ত্বই হাজার বুদ্ধিপ্রয়োগে পাবার কোনো উপায় নেই। উদ্ভট কল্পনা বা অনুমানই এসব তত্ত্বের উৎস। মানুষের বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তের অনিবার্যতা এসব ক্ষেত্রে নেই, গণিত বা জ্যামিতির ক্ষেত্রে যা রয়েছে।

সহজেই অনুমান করা চলে যে প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্বগুলি নাড়াচাড়া করতে করতেই একসময় এসব তত্ত্বের নিরর্থকতা সক্রেটিসের কাছে স্পষ্ট হয়ে থাকবে। এর পরেই তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। অনেকটা যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি মৈত্রেয়ীয় বাণীর মতো—'যা আমাকে অমৃতের সন্ধান দেবে না, তা নিয়ে আমি কি করবো?' অতএব বিশ্ব এবং সৌরজগতের ব্যাখ্যা দেবার কোনো চেষ্টা সক্রেটিস করলেন না। তিনি তাঁর মনোযোগের কেন্দ্র এবং অনুসন্ধানের বিষয় সম্পূর্ণ বদলে ফেললেন এবং সত্য অনুসন্ধানের জন্যে একেবারে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে একটা পথ বের করার চেষ্টা করলেন। তাঁর মনোযোগের বিষয় হলো মানুষ, প্রকৃতি নয়। সক্রেটিস দর্শনের কেন্দ্রে স্থাপন করলেন মানুষ। ধর্ম, নৈতিকতা, জ্ঞান, এসবই হলো তাঁর প্রধান আলোচনা ও অনুসন্ধানের বিষয়। মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে। এজন্যে তাকে সুবিচার, কর্তব্যপরায়ণতা, শৌর্য, সংযম, সদ্‌গুণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবেই। ন্যায়বিচার, কর্তব্য-অকর্তব্য, ভালো-মন্দ ইত্যাদি প্রশ্নে মতিস্থির করতে না পারলে সুশৃঙ্খলভাবে সমাজে বসবাস করা অসম্ভব। সক্রেটিসের কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে বিশ্বজগতের গঠন আমাদের অজানা এবং অবিদিতব্য, আমরা একমাত্র নিজেদেরই জানতে পারি। 'নিজেকে জানো' বলে তাঁর যে কথাটা খুব প্রচলিত আছে, সে কথাটার মূল এখানেই।

সক্রেটিসের পক্ষে এই প্রকৃতি-বিজ্ঞান পরিহার, দর্শনের জন্যে নতুন বিষয় নির্ধারণ এবং নিজের জন্যে একটি পথ অনুসন্ধান—এসবেরই সূত্রপাত তাঁর যৌবনকালে, পেলোপনেসীয় যুদ্ধের কয়েক বছর আগে। তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাতে তাঁর চিন্তার ধারা বদলে যায়, তিনি তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারেন, বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ একেবারে অন্তর্হিত হয়। এই ঘটনা হচ্ছে ডেলফির এ্যাপোলো-মন্দিরের দৈববাণী। বার্নেট

বলেছেন, পোটেইডিয়ার যুদ্ধে যাবার আগেই ডেলফির দৈববাণীর ব্যাপারটা ঘটে, এই সময় তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের মতো এবং এই ঘটনা তাঁর জীবনকে দুইভাবে বিভক্ত করে দেয়। এর পরে তিনি জীবনের প্রধান কর্ম কি হবে তা স্থির করে নেন এবং বাকি জীবন সেই কর্মেই উৎসর্গ করেন। ডেলফির দৈববাণীর মধ্য দিয়েই কিন্তু সক্রেটিসের 'ডায়ালেকটিক পদ্ধতি'র সূত্রপাত ঘটে। এই পদ্ধতির আদর্শ উদাহরণ হচ্ছে প্লেটোর ডায়ালগগুলি। যাই হোক, এইবার ঘটনাটা একটু খুলে বলা যাক।

পেলোপনেসীয় যুদ্ধের আগে, সক্রেটিস যখন নিজের জন্যে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি এথেন্সে একেবারে অপরিচিত তা কিন্তু নয়। অল্পবিস্তর পরিচিতি তিনি তখন লাভ করেছেন, একদল তরুণ ভক্তও জুটেছে তাঁর চারপাশে। কেউ কেউ তাদের ভবিষ্যৎ পেশা, জীবিকা বা অধ্যয়নের বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ চাইছে। এদেরই একজন, চেয়ারেফন উৎসাহের আধিক্যে ডেলফির এ্যাপোলো-মন্দিরে জিজ্ঞেস করে বসলো, সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞানী কেউ আছেন কিনা। পার্নাসাস পাহাড়ের সানুদেশে প্রাচীন ডেলফি শহরের এই এ্যাপোলোর প্রত্যাদেশ স্থানটি তখন খুবই বিখ্যাত। যাই হোক, চেয়ারেফনের প্রশ্নের জবাবে দেবী পাইথিয়া জানিয়ে দিলেন সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই।

এই ধরনের দৈববাণীতে সক্রেটিসের কতোদূর আস্থা ছিলো বলা কঠিন। থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। তবে এভাবে মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করা, প্রত্যাদেশ পাওয়া এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার চল তখন খুব ছিলো। সক্রেটিসের ধর্মমতের যা পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তিনি আত্মা এবং আত্মার অমরতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে আমরা জানি, কিন্তু দেব-দেবীর পাঠানো দৈববাণী সত্যই কতোটা বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করতেন তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। তবে সমস্ত জীবনে সক্রেটিস কখনো এথেন্সবাসীর আচরণবিধি ধর্মবিধি লঙ্ঘন করেননি।

ডেলফি-র দৈববাণীর পরে খুব মজার ঘটনা ঘটতে থাকলো। প্লেটো দেখিয়েছেন সক্রেটিস এই দৈববাণী সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ করলেন না। দৈববাণী যে ভুল সেটা প্রমাণ করার জন্যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সচেষ্ট হলেন। এর পরের কথাগুলি সক্রেটিসের মুখ থেকেই শোনা যাক। সক্রেটিসের মুখ থেকে মানে 'এ্যাপোলজি' ডায়ালগে সক্রেটিসের মুখে প্লেটো যে কথাগুলি বসিয়েছেন সেই কথাগুলি :

> আমি যখন উত্তরটা (দৈববাণী) শুনলাম, তখন নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম : দেবতা কি বলতে চান ? কিসের ইঙ্গিত করতে পারেন তিনি ? কারণ ছোটো বড়ো কোনো বিষয়েই নিজেকে আমি কখনো জ্ঞানী ভাবি নি। তাহলে আমিই, সবচেয়ে জ্ঞানী এই কথা বলে তিনি বোঝাতে চানটা কি ? তিনি তো আর মিথ্যে বলতে পারেন না, অবশ্যই না— সেটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।
>
> ...শেষে অনেক চিন্তার পর আমি এইরকম একটা কর্মপন্থা গ্রহণ করলাম। জ্ঞানী বলে ধারণা হয় এমন একজন ব্যক্তির কাছে গেলাম আমি, ভাবলাম দেবতার দৈববাণী এইবার খণ্ডন করা যাবে এবং আমি দেবস্থানে বলতে পারবো, 'এই লোকটি আমার চেয়ে জ্ঞানী আর তুমি বলেছ আমিই সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানী।' এখন এই যে লোকটি,

তাঁর নাম করার দরকার নেই। এথেন্সের নাগরিকদেরই একজন, এই লোকটির সঙ্গে যখন আমি কথা বললাম, আমার এই রকম অভিজ্ঞতা হলো, আমি ভাবলাম, 'অনেকের কাছে এই লোকটিকে জ্ঞানী বলে মনে হয়, এই লোকটির নিজেরও তাই ধারণা, কিন্তু সে তো তা নয়।' এরপর আমি সেই লোকটিকে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে তিনি নিজেকে জ্ঞানী বলেন বটে, তিনি কিন্তু তা নন। এই চেষ্টা করতেই তিনি তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন...তখন আমি ভাবলাম, 'আমি অন্তত এই লোকটির চেয়ে জ্ঞানী। সম্ভবত আমাদের দুজনের কেউ সৌন্দর্য সম্বন্ধে বা কল্যাণ সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু সে চিন্তা করে, সে সৌন্দর্য বা কল্যাণ সম্বন্ধে কিছু জানে, যখন বেচারা কিছুই জানে না—অন্যদিকে আমি যদি-বা কিছু না-জানি, অন্তত ভাবি না যে আমি কিছু জানি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমি যেন এই লোকটির চেয়ে সামান্য বেশি জ্ঞানী।—অন্তত এই হিসেবে যে আমি যখন কোনো বিষয়ে কিছু জানি না, তখন অন্তত কল্পনা করি না যে সে বিষয়ে কিছু জানি।' এই ঘটনার পরে আমি আর একজনের কাছে গেলাম, যাঁকে আরও বড়ো জ্ঞানী বলে ধারণা হয় এবং আমার ঠিক একইরকম অভিজ্ঞতা হলো এবং তিনিও আমার উপর মহাখাপ্পা হলেন এবং এইরকম আরও অনেকের বেলায় হলো। এভাবে আমি সকলের কাছে গেলাম, একের পর এক সকলের কাছে যা ঘটছিল সে সম্পর্কে সচেতন থাকলাম, দুঃখিত হলাম এবং আশঙ্কা হতে থাকলো যে সকলেই আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন।...

'এ্যাপোলজি'র এই অংশ থেকে 'সক্রেটীয় শ্লেষ' সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা আরও পরিষ্কার হবে। সক্রেটিস নিজের অজ্ঞানতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করতেন এবং অন্যের কাছ থেকে শেখার জন্যে অশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন। সক্রেটিসের এই ধারণাটা যে আদৌ তাঁর ভড়ংবাজি ছিলো না, তা আগেই বলা হয়েছে। তিনি প্রকৃতই বিশ্বাস করতেন যে আমাদের জীবন অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যেই কেটে যায়, যা জানা প্রয়োজন—যেমন কল্যাণ, সৌন্দর্য, সত্যের স্বরূপ—তা আমাদের আর জানা কখনোই হয়ে ওঠে না। অধিকাংশ লোক মনে করে, যেসব বিষয় অবলম্বন করে তারা জীবন ধারণ করছে, সেসব বিষয়ে তাদের স্পষ্ট জ্ঞান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা সত্য নয়। ন্যায়বিচার বা সাহস কাকে বলে তা নিয়ে প্রশ্ন করলে দেখা যাবে প্রায় প্রত্যেকেরই তৈরি জবাব আছে। কিন্তু সেসব জবাব সম্পর্কে সক্রেটিসের দু-একটি প্রাণঘাতী প্রশ্নের পরই বোঝা যায়, উত্তরগুলি ফাঁকা ও অন্তঃসারশূন্য, উত্তরদাতাদের ন্যায়বিচার বা সাহস সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।

ডেলফির দৈববাণী যে সক্রেটিসের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো সেটা বোঝা কঠিন নয়। তাঁর সত্তর বছরের জীবনের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে এই ব্যাপারটা ঘটে। পেলোপনেসীয় যুদ্ধের কিছু আগে যদি এটা ঘটে তাহলে তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি হওয়া সম্ভব নয়। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই, এই ঘটনার দুদিকে দুই সক্রেটিস। দৈববাণীর আগের সক্রেটিস হচ্ছেন সাধারণ সক্রেটিস, এথেন্সে নিরুপদ্রবে কালযাপন করেছেন, স্বকালের নানা তত্ত্বের চর্চা করেছেন, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁর নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্যে অল্পবিস্তর

পরিচিতি লাভ করেছেন। আর বড়ো-জোর তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁর জীবনব্যাপী অনুসন্ধান ও প্রচারের বিষয়গুলি সম্বন্ধে মনস্থির করতে পেরেছেন এবং নিজের জন্যে স্বতন্ত্র একটা পন্থা বের করার চেষ্টা করেছেন। এই পর্যন্ত। কিন্তু ডেলফির দৈববাণীর পরে আমরা পাই এক অনুপ্রাণিত সক্রেটিস। দেবতার দৈববাণীকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে যে তিনিও কিছু জানেন না, অন্যেরাও কিছু জানে না, তবু একটি কারণে তিনি অন্যদের চেয়ে জ্ঞানী ; তিনি জানেন, তিনি অজ্ঞান, অন্যেরা তা জানে না। 'একমাত্র দেবতাই জ্ঞানী—দৈববাণীর ভিতর দিয়ে দেবতা এইটাই বলতে চেয়েছেন যে মানুষের জ্ঞানের মূল্য সামান্য বা কিছুই নয়। আসলে দেবতা সক্রেটিসের কথা বলতেই চান নি, তিনি যে আমার নাম ব্যবহার করেছেন, সেটা উদাহরণ দেবার জন্যে—যেন তিনি বলতে চান, হে মানবগণ, সেই ব্যক্তিই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ যে সক্রেটিসের মতো জানে যে তার জ্ঞানের কানাকড়ি মূল্যও নেই।'

এই ঘটনার পরে সক্রেটিস স্থির করে নিলেন যে এথেন্সবাসীদের কাছে তাঁদের অজ্ঞানতা প্রদর্শন করা এবং জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করাই হবে তাঁর বাকি জীবনের কাজ। তাঁর প্রত্যয় জন্মালো, 'এথেন্সবাসীদের তাদের অজ্ঞানতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করার জন্যেই তিনি বিধিনির্দিষ্ট।' বাকি জীবনটা তিনি এই কর্মে নিবেদন করেছিলেন। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। এজন্যে বরণ করে নিয়েছিলেন জীবনব্যাপী দারিদ্র্য। কি অসাধারণ উক্তি তাঁর, 'অপরীক্ষিত জীবন, যাপন করারই যোগ্য নয়।' অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে বিজ্ঞানী যেভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের কাজ করেন, ঠিক সেইভাবে বুদ্ধি ও যুক্তির আলোর নিচে রেখে মানব জীবনকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করার কথা বললেন সক্রেটিস। নিজের জীবনের মুখোমুখি হলো না যে ব্যক্তি—কর্তব্য অকর্তব্য, উত্তম অনুত্তমের আদর্শ খুঁজলো না যে মানুষ, ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দ, সুন্দর কুৎসিত, শ্রেয় পরিহার্য স্থির করতে পারলো না, তার বেঁচে থাকা তো উদ্ভিদ বা কীট-পতঙ্গের বেঁচে থাকা। তার মূল্য কি ? অতএব মানুষের জীবন, মানুষের সমাজ, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে এথেনীয় নাগরিকের জীবন—ব্যক্তিজীবন, যৌথজীবন দুই-ই-এথেনীয় সমাজ, এথেনীয় নাগরিকের সঠিক আচরণ, নগর-রাষ্ট্রের শেষ লক্ষ্য, উত্তম জীবনের আদর্শ—এসবই সক্রেটিসের নিরন্তর সমালোচনার অধীনস্থ হলো। এইসব বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলি তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন হতে থাকলো। পথে-ঘাটে, এথেন্সের বাজারে, ভোজসভায়, উৎসব-অনুষ্ঠানে যে কোনো ইচ্ছুক ব্যক্তির সঙ্গে সক্রেটিস মুহূর্তে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। আলোচনার বিষয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হতো কথোপকথনের ভিতর দিয়ে। সেইসব আলোচনা প্লেটোর ডায়ালগগুচ্ছ হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। কোনোটির আলোচনার বিষয় 'ন্যায়বিচার' (জাস্টিস), কোনোটির বিষয় 'সংযম' (টেম্পারেন্স), কোনোটির বিষয় 'বন্ধুত্ব' (ফ্রেন্ডশিপ)।

সক্রেটিস তাঁর নিজের এই কাজকে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন বলেছেন এবং নিজেকে 'এ্যাপোলোর রাজহংসযূথের' সহ-ক্রীতদাস বলে বর্ণনা করেছেন।

মধ্যবয়সে সক্রেটিসের এই যে ব্রত তা পেলোপনেসীয় যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে বিঘ্নিত হয়। নাগরিক-যোদ্ধা হিসেবে তিনি সানন্দে এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন সে কথা আমরা আগে বলেছি। যুদ্ধক্ষেত্রে যে তিনি সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন—কিবিয়াডিসের বর্ণনা থেকে সে কথাও আমরা জেনেছি। প্লেটো তাঁর 'সিম্পোজিয়াম'-এ এই আল্‌কিবিয়াডিসকে দিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রেটিসের শৌর্য-বীর্যের অনুপ্রাণিত বিবরণ পেশ করিয়েছেন। আল্‌কিবিয়াডিস একটি যুদ্ধে আহত হয়ে পড়েন, তিনি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত নিজের জীবন বিপন্ন করে সক্রেটিস তাঁর উপর নজর রাখেন। এরপর যুদ্ধে শৌর্য প্রদর্শনের জন্যে যখন আল্‌কিবিয়াডিস পুরস্কৃত হন, তিনি বলেন যে পুরস্কারটি তাঁর নয়, সক্রেটিসের প্রাপ্য। অনুরূপ ঘটনা ঘটে ডেলিয়ন যুদ্ধে। এই যুদ্ধে এথেনীয়রা পিছু হটছিলো। সেই সময় ল্যাচেসকে নিয়ে কি অসাধারণ ঠাণ্ডা মাথায় নজিরবিহীন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে সক্রেটিস বিপদমুক্ত এলাকায় ফিরে আসেন তার বর্ণনা আল্‌কিবিয়াডিস দিয়েছেন, ল্যাচেসও দিয়েছেন। আমাদের মনে রাখা দরকার ডেলিয়ন-এর যুদ্ধের সময় সক্রেটিসের বয়স ছিলো ছেচল্লিশ বছরের মতো।

সক্রেটিস যুদ্ধাভিযানে যোগ দেবার আগে থেকেই এথেন্সের কিছু কিছু তরুণ তাঁর আশপাশে জুটতে শুরু করেছিল একথাটা একবার বলা হয়েছে। কারা এই তরুণ ? কেনই বা তারা সক্রেটিসের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলো ? উত্তরে বলা যায়, নানা কারণে তারা আসতো, কেউ আসতো ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠির সন্ধান পেতে, কেউ আসতো সক্রেটিসের কথা শুনতে, কেউ বা আসতো সক্রেটিস যেভাবে অন্য লোকের অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতা নির্মমভাবে উদোম করে দিতেন তা দেখতে। এথেন্সের রাজনৈতিক জীবনে কিভাবে সফল হওয়া যায় সে শিক্ষাও নিতে কেউ কেউ আসতো। যেমন ক্রিটিয়াস। এঁর কথা আগে একবার বলা হয়েছে। তারপর চেয়ারেফন, প্লেটোর কাকা, যাঁর সূত্রে প্লেটো সক্রেটিসের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং যিনি ডেলফি-প্রত্যাদেশ চেয়েছিলেন।

তরুণরা যে দলে দলে সক্রেটিসের চারপাশে জড়ো হচ্ছিলো, তাতে এথেন্সের ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ, প্রথাসিদ্ধভাবে চলতে অভ্যস্ত সাধারণ নাগরিক এবং ভিন্ন ভিন্ন নানা কারণে নানা জনের মধ্যে সক্রেটিসের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্ম হতে থাকে। এই বিরূপতাটাই পেকে ওঠে ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্ব সালে সক্রেটিসের বিচারের সময়। ঐ যে তিনি যুক্তিতর্কের বান ডাকিয়ে আলোচনা করতে বসতেন, পবিত্র, অপবিত্র, সুন্দর কুৎসিত সব বিষয়কে যুক্তির অস্ত্রে তুলোধোনা করতেন, প্রচলিত সত্য মিথ্যা আচার বিশ্বাস প্রথা আচরণ সবকিছুকেই ধূলিসাৎ করে দিতেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে—এ থেকে অনেকের ধারণা হয়েছিলো, তিনি আসলে একজন সোফিস্ট। শুধু তফাৎ এই যে তিনি সোফিস্টদের মতো শিক্ষা দিয়ে অর্থগ্রহণ করতেন না। তরুণদের সঙ্গে সক্রেটিসের সম্পর্ক নিয়ে তো অনেক বিশ্রী কথা ওঠে। আলকিবিয়াডিস পরবর্তীকালে বাইরে গিয়ে এথেন্সের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আল্‌কিবিয়াডিসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো বলে তাঁর কাজের জন্যে সক্রেটিসকে দায়ী করা হয়।

এইসব কথা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করবো। তার আগে দেখা যাক কেন এথেন্সের তরুণরা তাঁর দিকে এইভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলো এবং তাঁকেই পথনির্দেশক বলে ভাবতে শুরু করেছিলো ? কুৎসিত-দর্শন, দরিদ্র, প্রৌঢ় সক্রেটিসের দেবার মতো তো কিছু ছিলো না। শাসকবর্গের প্রিয়পাত্র ছিলেন না তিনি, উঁচু মহলের সঙ্গে ছিলো না কোনো যোগাযোগ, কোনো কিছুরই ধার ধারতেন না তিনি। তাহলে ? এর একটা ছোট্ট জবাব হচ্ছে, যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে আসতেন, তাঁরাই প্রবেশ করতেন এক মহত্তর উন্নততর জীবন-বৃত্তে। 'অন্যদের উন্নত করার' অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো তাঁর। চুম্বকের মতো আকর্ষণশক্তি ছিলো সক্রেটিসের ব্যক্তিত্বের, তাঁর সান্নিধ্যে এলে মোহগ্রস্ত অভিভূত এবং পরাস্ত না হয়ে উপায় থাকতো না কারো। তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো : 'মানবজাতির নৈতিক উন্নতি সাধন। এ কাজ তো আর নৈতিক উপদেশ বিতরণ করে হয় না, একমাত্র ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন এবং মানুষকে তাদের নিজেদের মুখোমুখি হবার কাজে প্রবৃত্ত করার ভিতর দিয়েই এটা হতে পারে।' এই জিনিসটাকেই আত্মজ্ঞান বলা হচ্ছে। নিজের ভিতরটা খোঁড়াখুঁড়ি করা, ভিতরে যা কিছু আছে তার সবটাই বুদ্ধি ও যুক্তির পরিষ্কার আলোতে মেলে ধরা। সক্রেটিস কিন্তু কারো হাতে আত্মজ্ঞান তুলে দিতে পারেন নি—কোনো প্রশ্নেরই চূড়ান্ত জবাব দেবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর কোনো সুসম্পূর্ণ দর্শনও নেই। কারণ তিনি জানতেন, তিনি কিছুই জানেন না। তিনি শুধু মানুষকে সংক্ষুব্ধ করে তুলতে পারতেন, বিরামহীন জিজ্ঞাসার যন্ত্রণায় তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতেন। তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই যে কোনো জ্ঞানগর্বিত মানুষের অহঙ্কার খসে পড়তো, তাঁর ভিতরের দৈন্য প্রকাশ পেয়ে যেতো, তিনি তখন উপলব্ধি করতে পারতেন, যেসব ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ বিশ্বাস, মত, সংস্কার নিয়ে তিনি এতকাল জীবন কাটিয়ে এলেন, তার কোনো কিছু সম্বন্ধেই তাঁর স্পষ্ট জ্ঞান নেই। তিনি সুন্দর সুন্দর বলে চেঁচিয়ে মরেছেন, কিন্তু জানেন না 'সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায়' ; তিনি সারাজীবন ন্যায়-অন্যায় ভালো-মন্দের উপর নির্দ্বিধায় রায় দিয়ে এসেছেন অথচ 'ন্যায়' সম্পর্কে, 'ভালো' সম্পর্কে তাঁর আদৌ কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। উত্তম বা আদর্শ জীবন কাটাচ্ছেন বলে হয়তো অহমিকা প্রকাশ করে এসেছেন, কিন্তু সক্রেটিসের দুটো প্রশ্ন থেকেই ধরা পড়ে যাচ্ছে যে জীবনের 'উত্তম' (Good) সম্বন্ধে তিনি কোনো ধারণা গড়ে তুলতে পারেন নি। অতএব সক্রেটিসের সঙ্গে আলাপের পরে জ্ঞানগর্বিত ব্যক্তিটির মনে দেখা দিতো এক প্রচণ্ড লজ্জাবোধ, অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে থাকার লজ্জাবোধ, কিছুই না জেনে বাগাড়ম্বরকে প্রশ্রয় দেয়ার লজ্জা, দেখা দিতো একধরনের হীনতার উপলব্ধি। তা ঐ অজ্ঞানতা সম্বন্ধে সচেতনতা থেকেই জন্ম নিতো। মানুষটি তখন পড়ে যেতেন এক রকম আত্মিক সঙ্কটের মধ্যে। তাই বলা চলে যে মানুষের অস্তিত্বের গভীরে প্রলয়ঙ্করী ঝড় সৃষ্টি করার অন্য নাম ছিলো সক্রেটিস। এই প্রচণ্ড আলোড়নই শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে তুলতো প্রবল জীবনতৃষ্ণা, মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠতার বোধ এবং শ্রেয়কে অনুসন্ধান ও প্রাপ্তির ক্ষান্তিহীন বাসনা। আল্‌কিবিয়াডিস বর্ণনা

করেছেন যে, সক্রেটিস জাগিয়ে তুলতে পারতেন গভীরতম আধ্যাত্মিক আবেগ, হীনতাবোধ, অপরিসীম লজ্জা, নিজের অপারগতার উপলব্ধি আর আত্মোন্নতির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। তরুণ সম্প্রদায়ের উপর সক্রেটিসের আলাপচারিতার কি রকম প্রভাব ছিলো, তার বর্ণনা প্লেটো তাঁর 'সিম্পোজিয়াম'-এ আল্‌কিবিয়াডিসের মুখে দিয়েছেন এইভাবে :

রূপক বা উপমার মধ্য দিয়ে যতোটা পারি আমি সক্রেটিসের প্রশংসা করার চেষ্টা করবো। এতে সম্ভবত সক্রেটিস ভাববেন, আমি তাঁকে নিয়ে মজা করছি—কিন্তু তা নয়, উপমা বেছে নিয়েছি আমি সত্যের খাতিরে, উদ্ভটত্বের জন্যে নয়। আমি বলছি যে, ভাস্কর্যের দোকানে আমরা সাইলেনসের যেসব মূর্তি দেখতে পাই সক্রেটিস ঠিক তাদেরই মতো দেখতে...আমি আরও বলছি, তিনি দেখতে অবিকল 'মাটির মার্সিয়াজ'-এর মতো। সক্রেটিস, আপনি দেখতে ঠিক এদেরই মতো, ঠিক কিনা।... আপনি যদি তা স্বীকার না করেন, তাহলে আমি সাক্ষী ডাকবো। আপনি কি বাঁশিওয়ালা নন, বাঁশিওয়ালার চেয়ে অনেক বেশি অদ্ভুত বাঁশিওয়ালা হচ্ছেন আপনি। সে তো অন্তত বাঁশি বাজিয়ে লোককে মোহগ্রস্ত করে। আপনি তাকে হার মানান, কেননা আপনিও মানুষকে তারই মতো মোহগ্রস্ত করে ফেলেন শুধুমাত্র কথার দ্বারা, কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করেই। যখন আমরা কারোর কথা শুনি, এমন কি খুব বড়ো বক্তার কথা হলেও আমরা কেউই তার এতটুকু তোয়াক্কা করি না। কিন্তু যখন কেউ তোমার কথা শোনে কিংবা কাউকে তোমার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করতে শোনে, যে পুনরাবৃত্তি করে সে যতোই নিস্পৃহ হোক না কেন যে তোমার কথা শোনে, সে ছেলে হোক, মেয়ে হোক বা বালক হোক একেবারেই বুদ্ধিহারা হয়ে যায় এবং অনুপ্রাণিত বোধ করতে থাকে। বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে মাতাল বলে ধারণা করছেন এই আশঙ্কা আমার মনে না আসা পর্যন্ত আমি হলফ করে আপনাদের বলে যাবো আমার উপর তাঁর কথার কি প্রভাব ছিলো এবং এখনো আছে। তাঁর কথা শুনতে শুরু করলেই এক অদ্ভুত উন্মাদনায় আমার হৃৎপিণ্ড লাফাতে থাকে, দুই চোখ থেকে ছোটে অশ্রুর ধারা। আরও অনেকেরই আমি এই একই অবস্থা হতে দেখেছি। পেরিক্লিস বা অন্যান্য ভালো বক্তার কথা যখন আমি শুনতাম, আমি এইমাত্র ভাবতাম যে এঁরা চমৎকার বলেন, কিন্তু সক্রেটিসের বক্তৃতা শোনার যে অনুভূতি তা কখনো বোধ করি নি। তাঁদের বক্তৃতায় আমার হৃদয় যন্ত্রণাবিদ্ধ বা ক্রুদ্ধ হতো না—যেমন সক্রেটিসের বেলায় হয়—আমি যেন ঠিক ক্রীতদাসের অবস্থান লাভ করেছি। এই 'মারসিয়াজ' সক্রেটিস আমাকে প্রায়ই এমন অবস্থার মধ্যে ফেলেছেন যে আমি ভেবেছি, যে-জীবন কাটাচ্ছি, সে-জীবন যদি এইরকমই থেকে যায়, তাহলে বাঁচাটাই নিরর্থক। এবং আমি নিশ্চিত জানি এখানে এই মুহূর্তে আবার যদি তাঁর কথা শুনি, আমি কিছুতেই সামলাতে পারবো না, ঠিক আগেরই মতো অবস্থা হবে আমার।...

...কাজেই আমি কান চেপে ধরি এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে ছুটে পালাই যেন মাটিতে আবদ্ধ থেকে তাঁর পাশে আমি বৃদ্ধ না হতে থাকি। দেখুন, তিনিই একমাত্র মানুষ যাঁর উপস্থিতিতে আমি গভীর লজ্জাবোধ করি। অথচ এই লজ্জাবোধের ব্যাপারটা আমার

ধাতে নেই। তিনি আমাকে যা করতে বলেছেন, আমি ভালোই জানি তা না করতে পারার কোনো যুক্তি আমি দেখাতে পারবো না, কিন্তু তাঁকে ছেড়ে আসার পরে, আমার জনপ্রিয়তা আমার জন্যে লজ্জাজনক একটা ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইজন্যে আমি পালিয়ে বেড়াই, পলাতক ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করি। যখনি তাঁকে দেখি, তাঁর কাছে আমি যে-সমস্ত স্বীকারোক্তি করেছি, সেজন্যে লজ্জা পাই। অনেকবার আমি এরকম অনুভব করেছি যে, দুনিয়া থেকে তাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মুছে গেলেই আমি আনন্দিত হবো। অন্যদিকে আবার যদি সেটাই ঘটে স্বস্তি পাওয়ার চাইতে আমি অনেক বেশি যন্ত্রণায় কষ্ট পাবো। সত্যিই আমি জানি না, সক্রেটিসকে নিয়ে কি করা যায়।

'মাংস ভেদ করে সাপের কামড়ের মতো' সক্রেটিসের কথা মানুষের আত্মায় প্রবিষ্ট হতো। আল্‌কিবিয়াডিস ছাড়া আরও একজন সাক্ষী হচ্ছেন মেনো। তিনি বলেছেন :

আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমাকে বলা হয়েছিল যে আপনি নিজেকে এবং অপরকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই করেন না। এখন আমি সত্যিই ভাবি যে আপনি আমাকে মোহগ্রস্ত করেছেন এবং আমার উপর নানারকম ভেলকিবাজির জাল বিস্তার করেছেন যাতে আমি সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ি। যদি একটু মজা করার অনুমতি পাই, তাহলে বলতে পারি শুধু আকারে নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও টর্পেডো-মাছের সঙ্গে আপনার বড়োই সাদৃশ্য আছে। টর্পেডো-মাছের কাছে গেলে বা তাকে স্পর্শ করলে শরীর বিবশ হয়, আপনার কাছে এসে আমারও তাই হয়েছে। আমার আত্মা এবং ঠোঁট দুখানি আক্ষরিকভাবে বিবশ এবং জানি না আপনাকে আমি কি জবাব দেবো। ভালো বা কল্যাণ সম্পর্কে আমি অনেক বক্তৃতা করেছি, বড়ো বড়ো সমাবেশে। এবং আমার ধারণামতো খুবই সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু এখন আমি বলতে পর্যন্ত পারি না, আমার ঐ বক্তৃতা কি বস্তু। আপনি যে কোথাও যান না, কখনো দেশ ছাড়েন না, মনে করি সেটা আপনার সুবিবেচনার কাজই হচ্ছে। কেননা বিদেশে একজন বিদেশী হিসেবে এইসব কাণ্ডকারখানা করলে যাদুকর বলে আপনি অচিরেই আটক হতেন।

এইসব সাক্ষ্য থেকে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না যে, সক্রেটিস ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ ; তাঁর চরিত্রে বিচিত্র এবং বিপরীত উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছিলো। ইস্পাতকঠিন, দৃঢ়, ঋজু ব্যক্তিত্বের মধ্যে আশ্চর্য মানবিক গুণের উপস্থিতি, ভোগস্পৃহা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি এবং সুস্থ অথচ তীব্র জীবনতৃষ্ণা—জীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ এবং অসমসাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুকে গ্রহণ—এরকম হাজারটা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করলেও তাঁর চরিত্র বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। সক্রেটিস নামক ব্যক্তিটি এ সমস্তই অনায়াসে অতিক্রম করে যান।

৪

সক্রেটিসের কোনো সুসম্বন্ধ দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থিত করা কঠিন। কারণ তিনি কিছুই লিখে রেখে যান নি। ফলে ব্যক্তি সক্রেটিসকে নিয়ে যে বিপত্তি ঘটে, তাঁর দার্শনিক মতবাদ নিয়েও আমাদের ঠিক একইরকম বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ সক্রেটিসের মতবাদ জানতে গিয়ে আমাদের অন্যের রচনার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে এবং সেই অন্য ব্যক্তিটি হচ্ছেন প্লেটো, যিনি নিজেই একজন খুব বড়ো দার্শনিক। তবে এখানে জটিলতা একটু কম এই কারণে যে সক্রেটিসের দর্শন উদ্ধার করতে আমাদের জেনোফন বা এ্যারিস্টোফেনিসের রচনার উপর নির্ভর করতে হয় না। অবশ্য এ্যারিস্টটলের রচনা থেকে সক্রেটিসের দর্শনের মূল্যবান আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু প্লেটোর অতিরিক্ত তাতে তেমন কিছু নেই। কিন্তু প্লেটো নিজেই তো কম গোলমাল পাকিয়ে যান নি। তাঁর অল্প কিছু ডায়ালগ বাদে বাকি সব ডায়ালগেই সক্রেটিস প্রধান বক্তা। এই কথাটা আগে একবার বলা হয়েছে যে প্লেটো তাঁর ডায়ালগগুলিতে সক্রেটিসের দর্শন যেন সক্রেটিসের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, তাঁর নিজের দর্শনও তেমনি সক্রেটিসের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন। এছাড়া কোনো কোনো ডায়ালগে সক্রেটিসের দর্শন অন্যের মুখের কথাতেও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই কারণে প্লেটোর ডায়ালগগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে একভাগের নাম দেয়া হয়েছে সক্রেটীয় ডায়ালগগুচ্ছ (অর্থাৎ যে ডায়ালগগুলিতে সক্রেটিসের দার্শনিক মত আছে) এবং অন্য ভাগের নাম হয়েছে প্লেটোনীয় ডায়ালগগুচ্ছ। তবে কোন্ ডায়ালগ কোন্ ভাগে পড়ে এ নিয়ে মহাবিতর্ক আছে। আমাদের পক্ষে এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়, এমন কি বিতর্কের একটা বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে বার্নেট দাবি করছেন, 'ধারণাতত্ত্ব' নামে যে বিশেষ তত্ত্বটিকে প্লেটোর মৌলিক অবদান বলে সচরাচর মেনে নেওয়া হয়, সে তত্ত্বটি আসলে সক্রেটিসের। তত্ত্বটিকে প্রথম পাওয়া যায় প্লেটোর 'ফিডো' ডায়ালগে এবং পরে আরও বিশদভাবে দেখা যায় 'রিপাবলিক'-এ। 'ফিডো'তে দেখা যায় তত্ত্বটি যৌথভাবে হাজির করছেন সক্রেটিস এবং পিথাগোরীয়গণ। সন্দেহ নেই যে পিথাগোরীয়দের সংখ্যাতত্ত্বই এই তত্ত্বের মূল। কিন্তু সক্রেটিসের হাতে পড়ে তত্ত্বটি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

খুব সহজ ভাষায় তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক। আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গে বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুর পার্থক্য আছে।

গণিতের আলোচনা মূলত বুদ্ধিগম্য বিষয়গুলি নিয়েই। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। আমাদের সকলেরই মনের মধ্যে সমানত্বের (Equality) ধারণা আছে। এই ধারণা আছে বলেই আমাদের পক্ষে দুটি সমান লাঠি বা দুটি সমান পাথর কল্পনা করা সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে আমরা কি কখনো দুটি সর্বাংশে সমান লাঠি বা সর্বাংশে সমান পাথর প্রত্যক্ষ করতে পারি ? বাস্তবের দুটি লাঠিকে বা দুটি পাথরকে যতো সমান বলেই মনে হোক না কেন, তারা কখনোই পুরোপুরি সমান হয় না, সামান্য—যতো সামান্যই হোক—ইতরবিশেষ থাকে। তাহলে, যে পাথর টুকরো দুটিকে একেবারে সমান বলে প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছে, এদের সম্বন্ধে বলতে পারি, এরা সমান নয়, সমান হবার পথে আছে। একথার মানে দাঁড়াচ্ছে, নিখুঁত সমানত্বের একটা ধারণা আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে সমান বস্তু নেই। খুব বেশি হলে বলা যায়, প্রত্যক্ষগোচর দুটি সমানবস্তু সমানত্বের ধারণার কাছাকাছি পৌঁছেছে মাত্র।

যে সমানত্বের ধারণার কথা বলা হলো, সেই ধারণাটি কি এক না বহু ? বলাই বাহুল্য যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বহু রকম সমান বস্তুর দেখা মেলা সম্ভব। যেমন দুটি সমান পাথর, দুটি সমান টেবিল ইত্যাদি। কিন্তু পাথর আর টেবিল আলাদা বস্তু। ঠিক একইভাবে যদি জিজ্ঞেস করা যায় সমানত্বের ধারণা কি এক, না বহু, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে সমানত্বের ধারণাটা প্রয়োগ করেই আমরা বলি টেবিল দুটি সমান বা পাথর দুটি সমান। সমানত্বের ধারণাটা তাহলে এক এবং এক বলেই স্থির, অপরিবর্তনীয় ও নিত্য। সমানত্বের ধারণাটা যদি একাধিক হতো, তাহলে দুই খণ্ড পাথরের বেলায় একরকম, আর দুটি টেবিলের ক্ষেত্রে আর একরকম সমানত্বের ধারণা প্রয়োগ করতাম। সেক্ষেত্রে সমান কাকে বলে বোঝাই সম্ভব হতো না। অতএব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয় যে সমানত্বের ধারণা হচ্ছে একটি চিরসত্য ধারণা—তা এক এবং অবিনাশযোগ্য, অন্যদিকে এই ধারণাকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারে এমন প্রত্যক্ষগোচর বস্তু নেই। প্রত্যক্ষগোচর দুটি সমান বস্তু সমানত্বের ধারণার কাছাকাছি কিন্তু কখনো হুবহু ঐ ধারণাকে গ্রহণ করতে পারে না। তাহলে কি বলা যায় না যে প্রত্যক্ষগোচর সমান বস্তু দুটি অনিত্য, পরিবর্তনশীল, অলীক ও ধ্বংসযোগ্য কিন্তু সমানত্বের ধারণাটি চিরসত্য ? তা যদি বলা হয় তাহলে এই ধারণাটি সত্তা এবং সমান বস্তু দুটি অসত্তা। সোজা কথায়, প্রত্যক্ষগোচর জগৎটাই অসত্তা। প্রত্যক্ষগোচর হওয়ার অর্থ হচ্ছে দেশে ও কালে অবস্থান করা। যা দেশে কালে অবস্থান করে তাই অসত্তা আর ধারণা যা দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর নয় তাই সত্তা। সমানত্বের ধারণাটি অতএব সত্তা। অসত্তা ইন্দ্রিয়গোচর বা ইন্দ্রিয়গোচর বলেই অসত্তা। অন্যদিকে সত্তা বুদ্ধিগোচর।

সত্তা অসত্তার এই যে সত্তাস্বারূপ্যতত্ত্ব তা পিথাগোরীয়রা মোটামুটি গণিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। সক্রেটিস তত্ত্বটিকে সেখান থেকে বের করে এনে তাকে নীতি ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার আমূল রূপান্তর ঘটালেন। নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বপ্রয়োগের একটা খুব সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক।

সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপকে সুন্দর বলি, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিকে সুন্দর বলি, কোনো বালিকার কমনীয় মুখমণ্ডলকে সুন্দর বলি, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা চিত্রকেও সুন্দর বলি। এই বস্তুগুলি পরস্পর থেকে একেবারেই আলাদা। তাহলে প্রত্যেকটিকে সুন্দর বলে শনাক্ত করছি কেমন করে ? এদের প্রত্যেকটির মধ্যে নিশ্চয় এমন কিছু আছে, যার জন্যে একটিমাত্র শব্দ 'সুন্দর' এদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাচ্ছে। কি সেই 'এমন কিছু' ? এই 'এমন কিছু' আর কিছুই নয়, এ হলো সুন্দরের ধারণা—যে ধারণাটি গোলাপের মধ্যে, বালিকার মুখে, জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির মধ্যে রয়েছে বলেই প্রত্যেকটিকে সুন্দর বলা সম্ভব হচ্ছে। এখন আবার প্রশ্ন—এই সুন্দরের ধারণাটি এক, না বহু ? ধারণাটি একটি অবিনাশযোগ্য নিত্য ধারণা। বস্তুগুলির কোনোটিই সুন্দরের ধারণা নয়—তারা প্রত্যেকেই ঐ ধারণা ধারণকারী বস্তু। সুন্দরের উদাহরণ মাত্র। তারা সবাই ইন্দ্রিয়গোচর, অসত্তা এবং বহু। তাদের প্রত্যেকেরই বিনাশ আছে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত গোলাপ ফুল বিলুপ্ত হলেও সুন্দরের ধারণার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হাবার সম্ভাবনা নেই। সুন্দরের সমস্ত উদাহরণ অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় সুন্দর বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলেও সুন্দরের ধারণার বিনাশ ঘটবে না। এইবার যদি প্রশ্ন করি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন্ বস্তুগুলি সুন্দর—তার সহজ জবাব হচ্ছে, যে যে বস্তুর মধ্যে সুন্দরের ধারণা আছে। সক্রেটিস এই প্রশ্নের বড়ো চমৎকার উত্তর দিয়েছেন, 'সৌন্দর্যের ধারণা ছাড়াও যদি কোনো কিছু সুন্দর থাকে তাহলে বুঝতে হবে সৌন্দর্যের ধারণাই ঐ বস্তুকে সুন্দর করেছে।'

সমানত্বের ধারণা বা সৌন্দর্যের ধারণা কি বিশেষ ধারণা ? অবশ্যই নয়, সৌন্দর্যের ধারণাটা একটা বিশেষ ধারণা হলে সেটাকে গোলাপ, বালিকার মুখ এবং জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির মতো বিভিন্ন বস্তুর উপর প্রয়োগ করা সম্ভব হতো না। এই ধারণাটা হচ্ছে একটি 'সামান্য ধারণা' বা 'সাধারণ ধারণা' যা উপরোক্ত বস্তুগুলির প্রতিটির মধ্যেই রয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ পরস্পর থেকে আলাদা কিন্তু তাদের প্রত্যেককেই মানুষ বলে চেনা সম্ভব হয় কি করে ? চেনা সম্ভব হয় এই কারণে যে পরস্পর থেকে যতো ভিন্নই তারা হোক, তাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে 'মানুষ'—এই সাধারণ ধারণাটি আছে। তাহলে মানুষের ধারণাটি একটি আকার বা রূপ যেমন সমানত্বের বা সৌন্দর্যের ধারণাটিও একটি আকার বা রূপ। এই ব্যাপারটাকে বোঝানোর জন্যে ইংরেজিতে 'concept', 'idea', 'universal', 'form' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দগুলির সূক্ষ্ম পার্থক্য নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। এই একই ব্যাপার বোঝানোর জন্যে আমরা 'ধারণা', 'সামান্য ধারণা', 'সার্বিক', 'আকার', 'রূপ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করবো।

'সামান্য ধারণা' বা 'রূপ'-এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সম্পর্ক কি ? আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে সৌন্দর্যের ধারণার সঙ্গে বিশেষ একটি সুন্দর গোলাপের সম্পর্ক কি ? বিশেষ গোলাপ বা বিশেষ মানুষ অসত্তা, কারণ এরা পরিবর্তনশীল এবং নশ্বর—কিন্তু সৌন্দর্যের ধারণা অথবা মানুষের সামান্য ধারণা পরিবর্তনশীল বা নশ্বর নয়। অতএব 'সামান্য ধারণা' সত্তা। বিশেষ গোলাপ, বিশেষ মানুষ ইন্দ্রিয়গোচর ;

সৌন্দর্যের ধারণা বা মানুষের ধারণা তা নয়, তারা কেবলমাত্র বুদ্ধিগোচর। তাহলে দুটি জগৎ পাওয়া যাচ্ছে—এক. ইন্দ্রিয়গোচর অসত্তার জগৎ ; দুই বুদ্ধিগোচর ধারণার জগৎ অর্থাৎ সত্তার জগৎ। দুই. জগতের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। একদিকে বহুবর্ণ, বিচিত্র, বস্তুপুঞ্জের জগৎ, অন্যদিকে বর্ণহীন শব্দস্পর্শগন্ধহীন পরিবর্তনহীন সত্তার জগৎ।

এই দুই জগতের মধ্যকার সম্পর্কটাকে বোঝাতে গেলে আগের প্রশ্নটাই আবার করতে হয়। ধারণার সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক কি ? সৌন্দর্যের ধারণার সঙ্গে সুন্দর বস্তুর সম্পর্ক কি ? মানুষের সঙ্গে বিশেষ মানুষের সম্পর্ক কি ? বোঝাই যাচ্ছে, সুন্দর গোলাপ যে সুন্দর তার কারণ সৌন্দর্যের ধারণা তার মধ্যে রয়েছে ; বিশেষ মানুষ যে মানুষ তার কারণ মানুষের ধারণা বিশেষ মানুষের মধ্যে রয়েছে। একটা সুন্দর গোলাপ কতোটা নিখুঁত সুন্দর তা নির্ভর করছে এ গোলাপটি সৌন্দর্যের ধারণার কতোটা নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করছে তার উপর। একজন বিশেষ মানুষ কতোটা নিখুঁত মানুষ তা নির্ভর করবে মানুষটি মানুষের ধারণার কতোটা কাছাকাছি তার উপর। এইখানেই তাহলে সেই বিখ্যাত 'অংশগ্রহণ'-এর কথাটা আসছে। সুন্দর গোলাপ সৌন্দর্যের ধারণায় অংশগ্রহণ করে, বিশেষ মানুষ মানুষের ধারণায় অংশগ্রহণ করে ; অন্য কথায় 'মানুষের ধারণা' বিশেষ মানুষকে অধিকার করে। এই অংশগ্রহণের অনুপাতেই সত্তার অনুপাত নির্ধারিত। বিশেষ মানুষ ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ অসত্তা—কিন্তু সে যে পরিমাণে 'মানুষের ধারণায়' 'অংশগ্রহণ' করেছে বা 'মানুষের ধারণা' যে পরিমাণে তাকে অধিকার করেছে ঠিক সেই পরিমাণে সে সত্তাবান হয়ে উঠেছে। কাজেই ইন্দ্রিয়গোচর জগতকে পুরোপুরি অসত্তা বলা যায় না। ধারণার জগত তার মধ্যে যে অনুপাতে প্রতিফলিত হচ্ছে, সেই অনুপাতে ইন্দ্রিয়গোচর জগত সত্তাবান। চোখের সামনের সুন্দর গোলাপটি অলীক—কিন্তু তা পুরোপুরি অলীক নয়—সৌন্দর্যের ধারণায় সেটা যতোটুকু অংশ নিতে পেরেছে, সেটা ঠিক ততোটুকুই সত্তাবান। এই 'অংশগ্রহণ' কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বস্তু সেক্ষেত্রে আর বস্তু থাকবে না, হয়ে যাবে বুদ্ধিগম্য সামান্য ধারণা। তবে যতো সামান্য ধারণার কাছাকাছি হতে পারবে, ততোই সত্তাবান বা বাস্তব হয়ে উঠবে।

আমরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারি, সামান্য ধারণা বলতে যা বোঝানো হচ্ছে তা শ্রেণী-নাম (Class-name) ছাড়া আর কিছু নয়। বিশ্বের অগণন বিশেষ মানুষের উপর প্রয়োগ করার জন্যে একটা শ্রেণী-নাম হচ্ছে 'মানুষ'। সেই শ্রেণী-নামটিকে বিশেষ বিশেষ মানুষ থেকে বিমূর্ত চিন্তার মাধ্যমে আলাদা করে নিয়ে তাকে সত্তার মর্যাদা দিয়ে বিশেষ মানুষকে সত্তাহীন অলীক বস্তুতে রূপান্তরিত করা একটা অসাধারণ তত্ত্ব সন্দেহ নেই, তবে এই তত্ত্বই তো সব ধরনের ভাববাদের মূল ভিত্তি।

'আকারতত্ত্ব' নামে পরিচিত এই সত্তাস্বারূপ্যতত্ত্ব মূলত সক্রেটিসের না প্লেটোর সে বিতর্কের মীমাংসা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ অলীক অসত্তার জগৎ

(World of becoming) এবং স্থির সত্তার জগৎ (World of being)—এই দুই জগতের পার্থক্য ইলীয় দার্শনিক পারমিনাইডিস ও জেনো করেছেন। প্রত্যক্ষের বস্তুর সঙ্গে চিন্তনের বস্তুর পার্থক্যের উপর জোর দিয়ে পিথাগোরীয়গণ 'বুদ্ধিগম্য আকার'-এর কথা প্রচার করেছেন। গ্রীক দর্শনে বিষয়টা বেশ পুরনো। কিন্তু তত্ত্বটির অভিনব এবং মৌলিক ব্যবহার করলেন সক্রেটিস। অধিবিদ্যার আওতা থেকে সরিয়ে এনে তিনি তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করলেন জ্ঞান, নীতি ও নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে। ফলে তত্ত্বটির মধ্যে যে ক্লান্তিকর বিমূর্ততা ছিলো, তা কেটে গেল, তা প্রযুক্ত হলো এথেনীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে। এই তত্ত্বের আওতার মধ্যে এসে পড়লো ধর্ম, নৈতিকতা ও রাজনীতির যাবতীয় প্রসঙ্গ। একটা বিমূর্ত তত্ত্বের এইরকম প্রয়োগ অভিনবই বটে, যাতে তত্ত্ব একটা সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, মানুষকে করে দিতে পারে বিপর্যস্ত, মানুষ নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়। এথেন্সবাসীর কাছে সক্রেটিসের তত্ত্ব হয়ে দাঁড়ালো চ্যালেঞ্জের মতো। অসাড় অচেতনভাবে বাঁচাটা সক্রেটিস সকলের জন্যেই অসম্ভব করে তুললেন। এথেনীয় নাগরিকদের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন এইভাবে আসতে শুরু হলো : জ্ঞান কাকে বলে ? যাকে জ্ঞান বলে ভাবা যায়, তা কি সত্য জ্ঞান ? ভালোত্ব কাকে বলে ? নাগরিকের সঠিক আচরণ কি ? গণতন্ত্র কি ? জ্ঞান ছাড়া কর্ম সম্ভব কি ? জীবনের শ্রেয় কি হতে পারে ?

প্রথমে জ্ঞানের কথাতেই আসি। ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ যখন মূলত অসত্তা, তখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের কোনো মূল্য থাকতে পারে না। অতএব সক্রেটিসের সিদ্ধান্ত হলো জ্ঞানকে অবশ্যই বুদ্ধি বা যুক্তিনির্ভর হতে হবে। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সব সময়েই ব্যক্তিগত, ভ্রান্তিসম্ভব এবং অনিশ্চিত। একমাত্র যুক্তিলব্ধ জ্ঞানই নিশ্চিত এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ। অন্ধের কাছে কোনো রঙের অস্তিত্ব নেই, চক্ষুষ্মানের কাছে আছে ; অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রং একজনের কাছে সত্য, আর একজনের কাছে নয়। কিন্তু 'সমান সমান সংখ্যার সঙ্গে সমান সমান সংখ্যা যোগ করলে যোগফল সমান হয়'—এই সত্য কোনো ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে না—এ সত্য বুদ্ধিগম্য, ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও চিরসত্য। তাছাড়া ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান সব সময়েই 'বিশেষ'-এর জ্ঞান—ইন্দ্রিয়মাধ্যমে কখনো 'সার্বিক'-এর জ্ঞান লাভ করা যায় না। রহিম করিম ইত্যাদি বিশেষ মানুষের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হতে পারে, কিন্তু মানুষের 'সামান্য ধারণা' কখনোই ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। তা সবসময়েই বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত এবং বুদ্ধিগম্য। সক্রেটিস বলেন, সত্যজ্ঞান অবরোহমূলক, তা সামান্য ধারণা থেকে শুরু হয়। অতএব কোনো বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার অর্থই হচ্ছে সে বিষয়ে 'সামান্য ধারণা' পাবার চেষ্টা করা। 'সংযম' সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে গেলে 'সংযম'-এর সামান্য ধারণা লাভ করতেই হবে। 'শৌর্য' সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। পৃথিবীতে যতো 'শৌর্য' জ্ঞাপক কাজ ঘটেছে, বা চোখের সামনে প্রদর্শিত হচ্ছে, সেগুলি আসলে 'শৌর্য' নামক সামান্য ধারণার বিশেষ বিশেষ উদাহরণ মাত্র। 'শৌর্য'-এর এইসব বিশেষ বিশেষ উদাহরণ থেকেই বুদ্ধির সাহায্যে গঠিত হবে 'শৌর্য'-এর সামান্য ধারণা। এই

সামান্য ধারণাটা না পাওয়া পর্যন্ত 'শৌর্য' সম্বন্ধে কোনোরূপ সত্যজ্ঞান সম্ভব নয়।

আমরা বুঝতে পারছি, 'সামান্য ধারণা' বলতে সক্রেটিস যা বোঝাতে চাইছেন, তা হলো আসলে 'সংজ্ঞা'। তাঁর জিজ্ঞাসাগুলি এই রকম : 'সংযম'-এর সংজ্ঞা কি ? 'ভালোত্ব'র (goodness) সংজ্ঞা কি ? 'সততা'র সংজ্ঞা কি ? এইসব সংজ্ঞা পাওয়া মানেই এইসব বিষয়ে সত্যজ্ঞান লাভ করা। এইজন্যে এ্যারিস্টটল সক্রেটিসকে আরোহ-পন্থা (induction) এবং সংজ্ঞা-নির্মাণ পদ্ধতির আবিষ্কর্তা বলেছেন। সংজ্ঞা পেতে গেলেই আরোহ-পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। রহিম, করিম, যদু ইত্যাদি বিশেষ মানুষ পর্যবেক্ষণ করে তবেই মানুষের 'সামান্য ধারণা' পাওয়া যায় ? 'সংযম' প্রদর্শনের অনেক উদাহরণ দেখে তবেই তো 'সংযম'-এর সংজ্ঞা নির্মাণ করা চলে।

সামান্য ধারণা বা সংজ্ঞা নির্মাণের কথা বলে এবং জ্ঞানকে বুদ্ধিনির্ভরতা দিয়ে সক্রেটিস জ্ঞানকে যে একটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তার জন্যে স্খলনহীন বিধান করলেন, তা কি আমরা লক্ষ্য করলাম ? আসলে ঠিক এইখানেই তিনি সোফিস্টদের চূড়ান্তভাবে আঘাত করেছেন। সোফিস্টরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেই চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন। 'মানুষই সবকিছুর পরিমাপক'—প্রোটাগোরাসের এই উক্তির চূড়ান্ত অর্থ দাঁড়ায় মানুষ নয়, ব্যক্তি মানুষই সবকিছুর পরিমাপক। ন্যায়বিচার, কর্তব্যপরায়ণতা, সৌন্দর্য বা ভালোমন্দ—প্রতিটি বিষয়ে ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাই সত্য। অর্থাৎ সত্যের বা ন্যায়ের বা সৌন্দর্যের ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো সর্বজনগ্রাহ্য মাপকাঠি নেই—এসব সম্পর্কে ব্যক্তি যা ভাবে, তাই সত্য। আমরা সহজেই বুঝতে পারি, সোফিস্টদের বক্তব্যের ভিত্তিই হচ্ছে এই তত্ত্ব যে জ্ঞান আসে ইন্দ্রিয় থেকে। কারণ ইন্দ্রিয় থেকে পাওয়া জ্ঞানের ব্যাপারেই মানুষে মানুষে ভেদ ঘটে, বুদ্ধিগম্য জ্ঞানে সে পার্থক্য দেখা যায় না। রং নিয়ে একজন অন্ধের সঙ্গে একজন চক্ষুষ্মানের বিবাদ হতে পারে—কিন্তু 'দুই আর দুই চার হয়' এ-বিষয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ হবে না।

মুশকিল হচ্ছে সোফিস্টদের মত গ্রহণ করলে এটাও মেনে নিতে হয় যে, কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান সম্ভব নয়। সর্বজনস্বীকার্য জ্ঞান নেই—জ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির মতামত। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক : সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মত আছে। এইসব আলাদা আলাদা মতের মধ্যে কোন্ মতটিকে সৌন্দর্য সম্বন্ধে সঠিক মত বলে চিহ্নিত করা যায় ? কোনোটাকেই নয়। প্রোটাগোরাসের তত্ত্ব অনুযায়ী সৌন্দর্য সম্পর্কে এসব বিভিন্ন মতের সবগুলি সত্য। তাহলে সৌন্দর্যের কোনো সামান্য ধারণার অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ সৌন্দর্য সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো জ্ঞান সম্ভব নয়। কেননা সোফিস্টদের মতে ব্যক্তির মতই শেষ কথা। বোঝাই যায়, এই তত্ত্ব মারাত্মক। এর প্রচার হলে সমাজকে রক্ষা করার, সমাজবদ্ধ মানুষকে কোনো বিশেষ দিকে চালিত করার কোনো উপায়ই আর অবশিষ্ট থাকে না। সক্রেটিস সোফিস্টদের এই শিক্ষার প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র কুহকে তিনি নিজেই এথেন্সবাসীদের কাজে সোফিস্ট বলে

পরিচিত হয়েছিলেন। এ্যারিস্টোফেনিসের 'ক্লাউডস' নাটকে সক্রেটিসকে সোফিস্টদের প্রধান বলে দেখানো হয়েছে।

'সমস্ত সত্যজ্ঞান সাধারণ ধারণার ভিতর দিয়ে আসে' (All knowledge is knowledge through concepts)—এই কথা বলে সক্রেটিস জ্ঞানকে যুক্তির শক্ত মাটির উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবে জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও তৈরি করলেন।

সক্রেটিসের জ্ঞানতত্ত্ব আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু নৈতিকতাই হচ্ছে তাঁর দর্শনের মূল সুর। এই বিষয়ে সোফিস্টদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মিল ছিলো। কারণ সোফিস্টদের শিক্ষাও প্রধানত নৈতিক প্রকৃতিরই ছিলো। নৈতিক বলতে কিন্তু নীতিশাস্ত্রীয় বলা হচ্ছে, নৈতিকভাবে কাম্য বা শ্রেয়-র কথা বলা হচ্ছে না।

আমরা সক্রেটিসের জ্ঞানতত্ত্ব একটু বিশদভাবে আলোচনা করেছি যাতে তাঁর নীতিতত্ত্ব ভালো বোঝা যায়। তাঁর নীতিতত্ত্ব তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সক্রেটিসের বিখ্যাত উক্ত হলো : 'সদ্‌গুণ ও জ্ঞান অভিন্ন' (Virtue is knowledge) ! আমরা 'Virtue' শব্দটির বাংলা করেছি 'সদ্‌গুণ'। 'Virtue'-র এই বাংলা প্রতিশব্দ আদৌ সন্তোষজনক নয়। কোনো কোনো ইংরেজি ভাষার লেখক 'Virtue' শব্দটি ব্যবহার না করে 'goodness' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমরা আলোচনার ভিতর দিয়েই বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করবো। এইজন্যে 'সদ্‌গুণ', 'ভালোত্ব', 'উত্তম' ও 'শ্রেয়'—এই কয়টি শব্দ আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

জ্ঞানের সঙ্গে ভালোত্বের অভিন্নতার কথা বলার অর্থই হচ্ছে, ভালোত্বের জ্ঞান ছাড়া জীবনে ভালোত্ব অর্জন করা সম্ভব নয় এই কথা বলা। এ পর্যন্ত কথাটা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এর পরেই সক্রেটিস বলেন, ভালোত্বের জ্ঞান ছাড়া যখন ভালোত্ব অর্জন করা যায় না, তখন 'মন্দ' যারা করে তারা নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে 'মন্দ' করে না, ভালোত্বের জ্ঞানের অভাবেই করে। 'মন্দ' তাহলে এক ধরনের অজ্ঞানতা। কথাটাকে প্রথম দৃষ্টিতে সাদামাটা বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে এই বক্তব্য সত্যই অসাধারণ। ভালোত্বের জ্ঞান থাকলে মানুষ ভালো করবে একথাটা তেমন নতুন নয়, কিন্তু ভালোত্বের জ্ঞান যে মানুষের আছে, সে মানুষ মন্দ করতেই পারে না, সে মানুষ ভালো করতে বাধ্য, যদি মন্দ করে তাহলে বুঝতে হবে তার ভালোত্বের জ্ঞান সত্যকার জ্ঞানের পর্যায়ে ওঠে নি, এ কথাটা কিন্তু নতুন। সক্রেটিস বলতে চান, মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দ করে না, করে অজ্ঞানতা থেকে। এমনকি তিনি এ পর্যন্ত বলতে চান যে ভালোত্বের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দ করে, সে মানুষ অনিচ্ছাকৃতভাবে মন্দকারীর চেয়ে ভালো। কেননা প্রথম ব্যক্তি জ্ঞানী না হলেও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পূর্ণত অজ্ঞান, তার কোনো আশাই নেই। যে মানুষ ভালো এবং মন্দ কি তা জানে, সে ইচ্ছে করে মন্দকে পছন্দ করতে পারে না। সক্রেটিস এ বিষয়ে পুরোদস্তুর নিশ্চিত ছিলেন যে, 'প্রকৃত দুর্ভাগ্য একটি—মন্দ করা এবং প্রকৃত সুখও

একটি—ভালো করা।' সাধারণভাবে 'কোনো মানুষই নিজেকে অসুখী করতে চায় না, বা নিজের ক্ষতি ডেকে আনতেও চায় না, অতএব কোনো মানুষই স্বেচ্ছায় মন্দ করবে না।' ভালোত্ব ও জ্ঞান অভিন্ন এবং ভালোত্বের জ্ঞানের অর্থই হচ্ছে বাস্তবে ভালো করা। এ পর্যন্ত যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে বলতে হয়, 'কোনো মানুষেরই মন্দ করা উচিত নয়, শত্রুর প্রতিও নয় এবং মন্দ করা থেকে বিরত থাকার জন্যে যে কোনো দুঃখ কষ্ট, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে নেওয়া উচিত। ভালোত্ব কোনোরকম শর্তের অধীন নয় এবং সব সময় তা সার্বিক বা 'সামান্য ধারণা'র মতো একই রকম থাকে।...ভালো মানুষ মন্দ মানুষের চেয়ে প্রবল, এবং মন্দ মানুষ কখনোই কোনো মানুষের প্রকৃত ক্ষতি করতে পারে না। কারণ প্রকৃত ক্ষতি হচ্ছে আত্মিক ক্ষতি। সেরকম ক্ষতি একমাত্র মন্দ কাজের ফলেই ঘটতে পারে।'

কথাগুলি ফাঁকা এবং অন্তঃসারশূন্য বুলির মতো শোনাচ্ছে বটে, হয়তো এই তত্ত্বের মধ্যে একটা দুর্মর ভাববাদী ভাবালুতাও থেকে যাচ্ছে। তবে যিনি এই তত্ত্ব দিয়ে গেছেন সেই সক্রেটিস নিজের জীবন খুইয়ে এই তত্ত্বের মনুষ্যদেহধারী মূর্তিমান প্রমাণ হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

'ভালোত্ব' যে জ্ঞান একথা বলার পরেই সক্রেটিস বলেছেন ভালোত্ব যেহেতু জ্ঞান সেহেতু তা শেখানো যায়। একথাটিও অভিনব। গণিত বা জ্যোতির্বিদ্যার মতো 'ভালোত্ব' যে শেখানো সম্ভব তা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের যে সংজ্ঞা আমরা ইতোমধ্যে সক্রেটিসের কাছ থেকে পেয়েছি, তাতে প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যে সম্ভব তা মানতেই হবে। সোফিস্টরা জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়লব্ধ বলে প্রচার করে জ্ঞানের বস্তুগত ভিত্তিটাকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। সক্রেটিসই সকল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সমতার কথা বলে এবং জ্ঞানকে বুদ্ধিজাত হিসেবে দেখিয়ে জ্ঞানের ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তুগত (objective) চরিত্র স্পষ্ট করে তোলেন। ভালোত্বের জ্ঞান যদি এই রকম একটি বুদ্ধিগম্য 'সার্বিক'-এর জ্ঞানের মতো হয়, তাহলে তা গণিতের মতো কেন শেখানো যাবে না ? মনে হয়, যুক্তি অখণ্ডনীয়। এর নিহিতার্থ হচ্ছে, যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে সৈনিক বা যোদ্ধা তৈরি করা যায়—ঠিক সেইভাবেই ভালোত্বের জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সমাজের সমস্ত মানুষকে ভালো করতে বাধ্য করা যায়। কারণ আমরা এর আগেই জেনে গেছি, ভালোত্বের জ্ঞান মানেই বাস্তবত ভালো করা। এর জন্যে দরকার দুটি জিনিস : এক. ভালোত্ব বা উত্তমের জ্ঞান ; দুই. উপযুক্ত শিক্ষক অর্থাৎ এমন মানুষ যাঁর ঐ জ্ঞান আছে।

এই তত্ত্বে পৌঁছুতে কিন্তু সক্রেটিসকে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করতে হয়েছে। তিনি নৈতিকতার এই তত্ত্বে পৌঁছেছেন তাঁর সেই বিখ্যাত কথোপকথনের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে। প্লেটোর কয়েকটি ডায়ালগে সক্রেটিসের এই নৈতিক তত্ত্বনির্মাণের বিবরণ ছড়িয়ে আছে। প্রথমে তিনি উল্টো কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, ভালোত্ব যে জ্ঞান এবং তা শেখানো যায় তা মানা যায় না। কারণ, সেক্ষেত্রে এথেন্সের সুবিখ্যাত রাজনীতিকরা নিজেরা যে ভালোত্ব অর্জন করেছিলেন, তা তাঁদের সন্তানদের শিখিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয়

নি দেখা যায়। সোফিস্টরাও একাজ করতে পারেন নি। তাহলে তাঁদের কাছে শিক্ষা পেয়ে রাজনীতিকদের ছেলেমেয়েরা অশ্বারোহণ বা সঙ্গীত শিক্ষার মতোই ভালোত্বের জ্ঞানও শিখতে পারতো। আসলে সোফিস্টরাও মনে করতেন ভালোত্ব হচ্ছে জ্ঞান এবং তা শেখানো যায়, সক্রেটিসও তাই মনে করতেন। এ বিষয়ে সোফিস্টদের সঙ্গে তাঁর কোনো পার্থক্য ছিলো না। তফাৎটা ছিলো অন্য জায়গায়। সেটা হচ্ছে 'ভালোত্ব' বলতে সোফিস্টরা এবং সক্রেটিস একই জিনিস বুঝতেন না। সোফিস্টরা যাকে 'ভালোত্ব' বলতেন, সক্রেটিস তাকে আদৌ ভালোত্ব বলে মানতে পারেন নি এবং সেইজন্যে তাকে জ্ঞান বলেই স্বীকৃতি দেননি। কাজেই তা শেখানো চলে একথা বলার অর্থ নেই।

সোফিস্টরা সাধারণ এথেনীয়দের মতোই মনে করতেন যে ভালোত্ব হচ্ছে এক ধরনের দক্ষতা বা নৈপুণ্য। তাঁরা 'মানুষের ভালোত্ব' এবং 'নাগরিকের ভালোত্ব' শিক্ষা দেওয়ার কথা বলতেন। এই দুই রকম 'ভালোত্ব' বলতে তাঁরা রাষ্ট্র ও পরিবার পরিচালনার দক্ষতা বুঝতেন। 'গ্রীকদের কাছে ভালোত্ব বলতে সবসময়ই সদর্থক কিছু বোঝাতো। এমন একটা কিছু যোগ্যতা বা ক্ষমতা যা দিয়ে বাস্তবভাবে কিছু করা সম্ভব হতো বটে কিন্তু তা খারাপ কিছু করা থেকে মানুষকে বিরত থাকতে প্ররোচিত করতো না।' গ্রীকরা শুধু শুধু কাউকে ভালো বলতে প্রস্তুত ছিল না, তাদের কাছে ভালো মানেই কিছু একটা করার জন্যে ভালো। এথেন্সের রাজনৈতিক অবস্থাটা সক্রেটিসের জীবনের শেষ দিকে এক ধরনের ফটকাবাজির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। 'ভালোত্ব' শব্দটার অর্থ দাঁড়িয়ে গেল এই ফটকাবাজিতে দক্ষতা প্রদর্শন। সোফিস্টরা তাঁদের মক্কেলদের অর্থগ্রহণের মাধ্যমে এই 'ভালোত্ব'ই শিক্ষা দেওয়ার কথা বলতেন। দলবাজি এবং দলীয় ষড়যন্ত্র পাকানোর কলায় পারদর্শিতা ছাড়া এই কথাটার আর তেমন কোনো অর্থ ছিলো না।

পারদর্শিতা বা নৈপুণ্য প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। সক্রেটিসের মতে ভালোত্ব ও জ্ঞান যখন অভিন্ন হয়ে যায় তখন ভালোত্ব বাস্তবে প্রদর্শিত হতে থাকে বটে অর্থাৎ ভালোত্ব বাস্তব আচরণে প্রকাশ পায় বটে, তাই বলে ভালোত্ব কলা নয়। এই বিষয়েও সক্রেটিসের সঙ্গে সোফিস্টদের পার্থক্য ছিলো। গ্রীকদের কাছে যে কোনো কলা (Art) হচ্ছে এক ধরনের বাহ্যিক যোগ্যতা অর্জন, যে যোগ্যতা খুশিমতো ব্যবহার করা যায় অথবা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা যায়। ভালোত্ব যে কলা নয় তার যুক্তি সক্রেটিস দিয়েছেন 'রিপাবলিক'-এ। যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, ভালোত্ব যদি কলা হতো তাহলে সাধু ব্যক্তি সবচেয়ে বড়ো চোর হতো। যেমন ডাক্তার হতো সবচেয়ে সফল খুনী। কারণ যে কোনো কলা বা যোগ্যতা আসলে বিপরীতের যোগফল। যোগ্যতার ভালো ব্যবহার যেমন সম্ভব, মন্দ ব্যবহার ঠিক তেমনিই সম্ভব। সক্রেটিস আর এক জায়গায় এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলেছেন যে সত্য বলতে যতোটা প্রজ্ঞার প্রয়োজন, মিথ্যা বলতে ততোটাই বা তার চেয়ে বেশি প্রজ্ঞার দরকার হয়। অতএব ভালোত্ব শুধুমাত্র যোগ্যতা বা পারদর্শিতার ব্যাপার নয়, আরও কিছু। ভালোত্ব মুষ্টিযুদ্ধের পারদর্শিতার সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই

পারদর্শিতা অর্জন করে মুষ্টিযোদ্ধা তার প্রতিবেশীদের ঠ্যাঙানি দিতে শুরু করলে তার শিক্ষক বলতে পারেন যে তাঁর কোনো দায় নেই। তিনি শিক্ষার্থীকে পারদর্শিতাটুকু শিখিয়ে দিয়েছেন মাত্র। ভালোত্বের শিক্ষক তা বলতে পারেন না। অতএব ভালোত্বকে শুধুমাত্র কলা বা বাহ্যিক ভালো-মন্দ নিরপেক্ষ একটা যোগ্যতা বলা চলে না। ভালোত্ব, সক্রেটিসের মতে, আত্মার স্বভাবের অঙ্গীভূত এবং এই কারণে 'ভালো' মানুষের পক্ষে মন্দ করা বা অন্যের ক্ষতি করা সম্ভবই নয়।

সক্রেটিস জ্ঞানকে যেমন বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান, ভালোত্বকেও তেমনি যুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চান, যাতে ভালোত্ব সকলের জন্যে জ্ঞানের মতোই ব্যক্তিনিরপেক্ষ 'সামান্য ধারণা' হিসেবে গণ্য হয়। যে ভালোত্ব জ্ঞানে পরিণত হয় নি তাকে তিনি ভালোত্ব বলে স্বীকার করবেন না বটে, তাই বলে সক্রেটিস অবাস্তব কল্পনার জগতেও বাস করতে চান নি। এই কারণে দেখা যায় ভালোত্বকে তিনি দুইভাগে ভাগ করেছেন। এক. লৌকিক ভালোত্ব ; দুই. দার্শনিক ভালোত্ব। লৌকিক ভালোত্ব হচ্ছে দৈনন্দিন ভালোত্ব, অভ্যাস যার ভিত্তি, যা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মতোই অস্থির ও পরিবর্তনশীল। আর দার্শনিক ভালোত্ব হচ্ছে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা স্থির ও অপরিবর্তনীয়। সক্রেটিস লৌকিক ভালোত্বকে একেবারে গুরুত্বহীন বিবেচনা করেননি।

'ভালোত্ব' সম্বন্ধে সক্রেটিসের শেষ কথা হলো, 'ভালোত্ব' এক। ভালোত্বের পেশাদার শিক্ষকদের মত হচ্ছে, অজস্র স্বতন্ত্র ভালোত্ব আছে, যে যার খুশিমত যে কোনো স্বতন্ত্র ভালোত্বের শিক্ষা নিতে পারে। যেমন কেউ শিখবে 'সততা' (honesty), কেউ শিখবে 'সংযম' (temperance)। এই দুটির মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই। অর্থাৎ সৎ ব্যক্তির অসংযমী হওয়ার মধ্যে কোনো স্ব-বিরোধিতা নেই। সক্রেটিস দেখিয়েছেন, সমস্ত স্বতন্ত্র ভালোত্ব—যেমন সংযম, শৌর্য, দূরদর্শিতা, সততা—সবই আসে জ্ঞান থেকে। অতএব শেষ পর্যন্ত জ্ঞানই ভালোত্ব। তার রূপ একটিই।

সক্রেটিসের একটা নিজস্ব ধর্মমত ছিলো, অথচ আমরা জানি তাঁর বিরুদ্ধে অধার্মিকতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। এথেন্সের দৈনন্দিন আচরণীয় ধর্মের সঙ্গে সক্রেটিসের সম্বন্ধ থাকা যে আদৌ সম্ভব নয়, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। সক্রেটিসের কথাই বা বলি কেন, সেকালের এথেন্সের শিক্ষিত মানুষদের লৌকিক দেবদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি ছিলো, তা মনে হয় না। দেবদেবীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা একরকম চলই ছিলো বলা চলে। তবু যে সক্রেটিস আলাদাভাবে অধার্মিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তার কারণ ছিলো ভিন্ন। বরং সক্রেটিসই প্রকাশ্যে লৌকিক ধর্মের নিন্দামন্দ করতেন না, তবু তাঁর নিজস্ব ধর্মমত এথেন্সের নাগরিকদের মধ্যে সন্দেহ জাগিয়ে থাকতে পারে।

সক্রেটিসের ধর্মমত খুব পুরনো অরফিক ধর্মমতের দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু সে আলোচনা এখানে বিশদভাবে করা সম্ভব নয়। দু একটি কথাই শুধু সংক্ষেপে বলা চলে। সক্রেটিস আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করতেন এবং এক

ধরনের জন্মচক্রেও তাঁর বিশ্বাস ছিলো। আত্মার অমরতা এবং জন্মচক্রের ভিতর দিয়ে আত্মার বার বার দেহ পরিগ্রহ—এই দুটি জিনিসই পিথাগোরীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রচারের বিষয়। অন্যদিকে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্মমতের সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য না করে পারি না।

আত্মার অমরতা সম্পর্কে সক্রেটিসের বক্তব্য হলো, দেহের মধ্যে আত্মা থাকে বন্দিদশায়। নশ্বর দেহ ধ্বংস হলে তবে আত্মা মুক্তি পায়। দেহধারী আত্মা প্রত্যক্ষগোচর জ্ঞানের মালিক। প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ যে চিরন্তন, স্থির, অবিনশ্বর, 'রূপ' বা 'আকার'-এর কথা আগে বলা হয়েছে সেই বুদ্ধিগম্য 'ধারণার জগৎ'-এর জ্ঞান একমাত্র দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত আত্মাই পেতে পারে। অতএব প্রকৃত জ্ঞান পেতে হলে দেহের ফাঁদ থেকে রেহাই পাওয়া প্রয়োজন। দেহ যতোক্ষণ আছে ততোক্ষণ বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের কোনো আশা নেই সত্য, তবে এই মর্ত্যের জীবনেও আমরা দৈনিক মৃত্যুর অভ্যাস করতে পারি, এই রক্তমাংসমজ্জার দেহকে অতিক্রম করে অল্প সময়ের জন্যে হলেও চিরন্তন সত্তার জগৎকে তার স্বরূপ লাভ করতে পারি এবং এইভাবে 'দেহমুক্ত' অবস্থায় অমরতার পূর্বস্বাদও পেয়ে যেতে পারি।'

সক্রেটিস আরও মনে করতেন দেহ প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে এবং নতুনভাবে তাকে বোনা হচ্ছে। এইভাবেই আত্মা বহু দেহ পার হয়ে অবিনশ্বর থেকে যায়।

সক্রেটিসের ধর্মমতের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্য লক্ষ্য করা গেল তা থেকে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে তিনি ছিলেন চীরপরিধানকারী ভোগস্পৃহাশূন্য সন্ন্যাসী। ইন্দ্রিয়বশ্যতা তিনি কখনো মেনে নেন নি সত্য, তাঁর মতো ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষও বিরল—তবু সুস্থ ও প্রবল জীবনতৃষ্ণা সক্রেটিসের সারাজীবনের চিন্তায় ও কর্মে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমি পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই 'সিম্পোজিয়াম'-এ বর্ণিত কবি আগাথনের দেওয়া ইতিহাসবিখ্যাত সেই নৈশভোজের কথা যেখানে সক্রেটিস সারারাত একনাগাড়ে পান করছেন ও আলাপ করছেন। তাঁর সঙ্গীসাথীরা একে একে নিদ্রায় ঢলে পড়লো, চারপাশে নিদ্রাভিভূত অতিথিরা, সকালের আলো ফুটলো এবং সক্রেটিস উঠে নিজের কাজে চলে গেলেন।

সক্রেটিসের ধর্মমত তাঁর অকল্পনীয় ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গপ্রবণতা, তাঁর ভয়ানক বাস্তবমুখিতা এবং সমকালীন এথেনীয় সমাজের আপোসহীন সমালোচনার প্রবণতাকে বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন করতে পারে নি। আশ্চর্য নয় যে তাঁকে নাস্তিক হিসেবেও অভিযুক্ত হতে হয়েছিলো।

৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সত্তর বছর বয়সে অভিযুক্ত সক্রেটিস আদালতের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হলো। এক. তিনি এথেন্সের উপাস্য দেবতাদের মানেন না। দুই. তিনি নতুন দেবদেবী চালানোর চেষ্টা করছেন এবং তিন. এথেনীয় তরুণদের তিনি এইসব শিক্ষা দিয়ে বিপথগামী করে তুলছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যাঁরা প্রকাশ্যে অভিযোগ এনেছিলেন, তাঁরা সবাই তুলনামূলকভাবে অখ্যাত ব্যক্তি, তাঁদের কারোর যে সক্রেটিসের উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিলো এমন মনে হয় না। কাজেই ধরে নিতে হবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, তাঁদের পেছনে ছিলো বিরাট একদল অজ্ঞাত অভিযোগকারী। এরা কারা ? এরা কি এথেন্সের জনসাধারণ ? এথেন্সের ক্ষমতাসীন চক্র ? কথাকথিত গণতন্ত্রীরা, যাঁরা ভাবতেন সক্রেটিস গণতন্ত্রের শত্রু এবং এথেন্সের অভিজাত দলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে ? এসব প্রশ্নের জবাব যাই হোক, একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় সে সক্রেটিসের বিপক্ষে একটা জনমত ছিলো। অন্তত একটা জনমত তৈরি করা সম্ভব হয়েছিলো। যে অভিযোগগুলি আদালতে পেশ করা হয়েছিলো সেগুলির বেশির ভাগই অতি তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন। আদালতের সামনে অভিযোগগুলিকে প্রমাণ করাও যায় নি। প্রমাণিত হলেও তাতে তৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা নয়, বড়ো জোড় তাঁর নির্বাসন বা কারাদণ্ড হতে পারতো। তার বেশি নয়।

অভিযোগ এনেছিলেন তিনজন। এঁদের নাম এ্যানিটস, মেলিটস এবং লাইকন। এ্যানিটস ছিলেন একজন গণতন্ত্রী রাজনৈতিক নেতা, মেলিটস ছিলেন এক 'প্রাণবন্ত অখ্যাত তরুণ' বিয়োগান্ত কবি। 'স্বল্পকেশ, হালকা দাড়ি এবং বড়শির মতো নাকওয়ালা'—এই হলো মেলিটসের চেহারার বর্ণনা। লাইকন ছিলেন আরও অখ্যাত এক ছান্দসিক।

প্লেটোর ডায়ালগ 'এ্যাপোলজি'তে সক্রেটিস আদালতের সামনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতাটি লিপিবদ্ধ আছে। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে প্লেটো সক্রেটিসের বক্তৃতা আমাদের অবিকল উপহার দিয়েছেন। তিনি সক্রেটিসের বিচারের সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনা ঘটে যাওয়ার বেশ কিছুকাল পরে তিনি নিশ্চয় স্মৃতি থেকেই সক্রেটিসের বক্তৃতাটি লিখেছিলেন। 'এ্যাপোলজি'কে অবশ্যই আমাদের সক্রেটিসের প্রকৃত বক্তৃতার কাছাকাছি বলে ধরে নিতে হবে।

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপনের মূল দায়িত্বটা ছিলো মেলিটসের। প্লেটোর মতে অভিযোগগুলি সম্বন্ধে মেলিটস নিজেই তেমন মনস্থির করতে পারেননি। কারণ সক্রেটিসের দু চারটি তীব্র জেরার মুখে তিনি মূল অভিযোগ থেকে সরে এসে বলে ফেলেন যে সক্রেটিস পুরোপুরি নাস্তিক। মূল অভিযোগে কিন্তু সক্রেটিসকে নাস্তিক বলা হয় নি বরং বলা হয়েছে তিনি তাঁর নিজস্ব নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে চান। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির কোনোটিই মেলিটস প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও কিন্তু সক্রেটিস দোষী সাব্যস্ত হলেন। আদালতের বিরাটসংখ্যক বিচারক এই প্রশ্নে বিভক্ত হলো এবং সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সক্রেটিস দোষী বিবেচিত হলেন। এথেনীয় আইন অনুসারে তখন অভিযোগকারীদের জিজ্ঞেস করা হলো তাঁরা সক্রেটিসের জন্যে কি শাস্তির প্রস্তাব করছেন ? অভিযোগকারীরা সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড দাবি করলেন। সক্রেটিস নিজে খুব ভালো করেই জানতেন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির কোনো ভিত্তি নেই, যাঁরা অভিযোগ এনেছেন, তাঁরা নিজেরাও সে কথা জানেন। সক্রেটিসের এটাও অজানা ছিলো না যে এসব অভিযোগ একেবারেই বাহ্য ব্যাপার, আসল অভিযোগ আছে এসবের পেছনে এবং তাঁর সম্পর্কে রায় হবে সেই পেছনের অভিযোগগুলিরই পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু সেজন্যে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা ছিলো না। আত্মসমর্থনে একটিও আপোসমূলক কথা তাঁর মুখ থেকে বের হলো না, বরং এমন সব কথাবার্তা শুরু করলেন, এমন একটা অবস্থান নিলেন যাতে বিচারকদের মন তাঁর উপর আরও বিরূপ হয়ে ওঠে। যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গেই এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সক্রেটিস নিজের মৃত্যুদণ্ড একরকম ডেকে নিয়ে এসেছিলেন।

সক্রেটিস দোষী সাব্যস্ত হবার পর অভিযোগকারীরা যখন সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড দাবি করলেন, তখনো তারা বিশ্বাসও করেন নি, এমন কি কামনাও করেন নি যে সত্যসত্যই সক্রেটিস মৃত্যুদণ্ড পান। গণতন্ত্রী এ্যানিটিস সক্রেটিসের কারাদণ্ড বা নির্বাসনদণ্ডকেই যথেষ্ট বিবেচনা করেছিলেন বলে মনে করা যায়। যাই হোক, এথেনীয় আইনের নির্দেশ ছিলো যে অভিযুক্ত ব্যক্তি পাল্টা শাস্তি প্রার্থনা করতে পারবেন। সক্রেটিস এথেনীয় আইনের এই সুযোগটা গ্রহণ করে মৃত্যুদণ্ডের বদলে মৃত্যুদণ্ডের কাছাকাছি কোনো একটা শাস্তি—কারাদণ্ড বা নির্বাসন—সহজেই চাইতে পারতেন। মনে হয় তিনি তেমন একটা শাস্তির প্রস্তাব করলে সেটা না মঞ্জুর হতো না। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, তেমন করলে দোষ স্বীকার করা হয়। তিনি বললেন, কোনো শাস্তিই তাঁর প্রাপ্য নয় বরং জনসেবার জন্যে, বা অলিম্পিক বিজয়ীদের যেমন মাঝে মাঝে সম্মান দেখানো হয়, তেমনিই সম্মান তাঁর প্রাপ্য এথেন্সে তাঁর ভূমিকার জন্যে। তবে এথেনীয় আইনে যখন শাস্তির বদলে শাস্তি চাওয়াটাই বিধান, সেজন্যে তিনি প্রস্তাব করছেন যে, তাঁকে এক 'মিনা' জরিমানা করা হোক। সক্রেটিসের বন্ধুরা বহু চেষ্টার পর এক মিনা থেকে তিরিশ মিনা পর্যন্ত জরিমানার প্রস্তাব করতে সক্রেটিসকে সম্মত করালেন এবং নিজেরা এই জরিমানা শোধ করার জামিন থাকতে প্রস্তুত হলেন। প্লেটো এই বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন।

সক্রেটিসের এই তিরিশ মিনা জরিমানার প্রস্তাব বিচারকদের কাছে আদালত অবমাননা বলে মনে হলো। তাঁরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, এখন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির একটিরও কোনো ভিত্তি ছিলো না। এইসব অভিযোগে কারো মৃত্যুদণ্ড হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এমন কি অভিযোগগুলি প্রমাণিত হলেও নয়। তিনি যে অধার্মিক বা নাস্তিক ছিলেন না তা খুবই স্পষ্ট। এথেন্সের প্রচলিত দেবদেবীকে তিনি মানেন না বলে যে অভিযোগ করা হয়েছিলো, তার সত্যই কোনো অর্থ নেই। তিনি কেন, এথেন্সের কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিই পৌরাণিক দেবদেবীর গল্প বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না। গীর্জা বা পুরোহিততন্ত্র অবলম্বন করে ধর্মীয় গোঁড়ামি তখনো দেখা দেয় নি। তাছাড়া গ্রীক দেবদেবীর উপর আক্রমণ তো সেই থেলিসের সময় থেকে চলে আসছে। পৌরাণিক দেবদেবীকে নিয়ে তামাশা করলে সেটা যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হতো, তাহলে সক্রেটিসের অনেক আগেই এ্যারিস্টোফেনিস মৃত্যুদণ্ড পেতেন। জিউসকে নিয়ে মশকরা করতে তাঁর একটুও বাধে নি। অবশ্য গ্রীক দেবদেবীদের বিশ্বাসঘাতকতা, লাম্পট্য, বদমাইশি ও কোন্দলপরায়ণতার গল্পগুলির প্রচার সক্রেটিস পছন্দ করতেন না। এইসব দেবদেবীর প্রতি বাধ্যতামূলক বিশ্বাস স্থাপন প্রাচীন ধর্মের অঙ্গ ছিলো না। ধর্মের কয়েকটি আচার আচরণ পালন করে যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে যা খুশি ভাবতে ও করতে পারতো। এইদিক থেকে অতি অধার্মিক, পাষণ্ড ও লম্পট ব্যক্তিও ধর্মের সমস্ত শর্ত পূরণ করে পরম ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারতো।

এরপর সক্রেটিসের সেই 'দৈবকণ্ঠ'-র কথা। সক্রেটিস বলতেন নিজের ভিতরে তিনি একটি 'কণ্ঠস্বর' শুনতে পান। মেলিটস বিষয়টা উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু এটার উপর তেমন জোর দেন নি। এই ব্যাপারটিকেই সক্রেটিসের নিজস্ব নতুন ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা বলে ভাবার কোনো কারণ এথেন্সবাসীদের ছিলো না। তাঁর 'দৈবকণ্ঠ'-র জন্যে, মাঝে মাঝে তিনি যে ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন সেজন্যে তারা সক্রেটিসকে বড়ো জোর ছিটগ্রস্ত একজন মানুষ ভাবতো। চলিত মত এই ছিলো যে, এগুলি হচ্ছে এক ধরনের রোগ। সাধারণ এথেন্সবাসী উন্মাদ ও মূর্চ্ছারোগীকেও 'পবিত্র' ভাবতে অভ্যস্ত ছিলো। 'দৈবকণ্ঠ'-র মালিক বলে সক্রেটিসও হয়তো সাধারণ মানুষের ঈর্ষার পাত্র ছিলেন, বিরাগের নয়।

নতুন দেবদেবী প্রবর্তনের অভিযোগটাও ফাঁকা। কারণ এই অভিযোগটা যখন উঠতে পারতো তখন ওঠে নি। সক্রেটিসের বিচারের বাইশ বছর আগে এ্যারিস্টোফেনিস তাঁর 'ক্লাউডস' নাটকে দেখিয়েছেন যে সক্রেটিস ঘোষণা করছেন দেবতা জিউস সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন, তাঁর জায়গায় 'ঘূর্ণিবাত্যা' এসেছেন। ঐ নাটকে আরো দেখা যায়, সক্রেটিস মেঘেদের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করছেন এবং 'নিঃশ্বাস প্রশ্বাস', 'বিশৃঙ্খলা' এবং 'বায়ু'র নামে শপথ নিচ্ছেন। সক্রেটিসের এইরকম চরিত্র আঁকা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয় নি।

তাহলে বোঝাই যায় যেসব অভিযোগ সক্রেটিসের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিলো তার একটিরও কোনো ভিত্তি ছিলো না এবং সেগুলির একটিও আদালতে প্রমাণিত হয় নি। বার্নেটের মতে, 'অভিযোগগুলির মানে যে কি তা কেউ জানতো না, এমন কি অভিযোগকারীরা নিজেরাও জানতো বলে মনে হয় না।'

আসলে সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডেরই অজুহাত ছিলো তাঁর বিরুদ্ধে আনীত আভিযোগগুলি। সক্রেটিসের প্রতি এথেন্সের তথাকথিত গণতন্ত্রী শাসকরা বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁরা আরো মনে করতেন অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। সক্রেটিসের বেশ কিছু শিষ্য ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তীকালে অভিজাত দল নিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই যে, তাঁর শিষ্যদের কাজের জন্যে সক্রেটিস আদৌ দায়ী ছিলেন না কিন্তু একথা ঠিক যে সক্রেটিস তৎকালীন এথেনীয় গণতন্ত্রের একজন কড়া সমালোচক ছিলেন। তাঁর তীব্র সমালোচনা থেকে এথেনীয় সর্বাগ্রগণ্য নেতা পেরিক্লিস থেকে শুরু করে কেউ রেহাই পান নি। প্লেটো বেশ স্পষ্ট করেই ইঙ্গিত করেছেন যে সক্রেটিসের মৃত্যুর কারণ তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

সক্রেটিস কখনোই সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নি। দুবার মাত্র তাঁকে এথেন্সের প্রশাসনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিলো। দুবারই তাঁর আচরণ সাধারণ এথেন্সবাসী ও এথেন্সের শাসকদের মনঃপূত হয় নি। প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে আর্গিনুসির নৌযুদ্ধে এথেনীয় নৌবাহিনীর একটা বিরাট বিজয় লাভ ঘটে। কিন্তু সেনাপতিদের অবহেলায় পঁচিশটি এথেনীয় যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হয়। জাহাজগুলির সমস্ত নাবিক ডুবে মারা যায় এবং এদের মৃতদেহ উদ্ধার না করেই সেনাপতিরা ফিরে আসেন। এথেন্সে এই খবর পৌঁছুলে অবহেলার দায়ে অপরাধী দশজন সেনাপতির বিচারের দাবি ওঠে। জনদাবির মুখে সব কয়জন সেনাপতির বিচার একসঙ্গেই সম্পন্ন করতে প্রস্তুত হয় এথেনীয় আদালত। কিন্তু এথেনীয় আইনে প্রত্যেক সেনাপতির আলাদা আলাদা বিচারের বিধান ছিলো। সেনাপতিদের শাস্তিদানের প্রবল উৎসাহে শাসকবর্গ যখন এই আইন ভঙ্গ করতে উদ্যত হয়, তখন সক্রেটিস তাতে বাধা দেন।' 'এ্যাপোলজি'তে সক্রেটিস তাঁর বক্তৃতায় বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

> এথেন্সবাসিগণ তোমরা জানো আমি কখনো কোনো পদ গ্রহণ করি নি, কিন্তু, 'পাঁচশো জনের পরিষদ'-এ (Council of Five Hundred) কাজ করেছি। তোমরা যখন সমুদ্রযুদ্ধে নিহত নাবিকদের লাশ ফেলে আসার জন্যে সেনাপতিদের বিচার করতে মনস্থ করলে, তখন আমার গোষ্ঠীর এ্যান্টিওচিস, পরিষদের সভাপতিত্বে ছিলো। তোমরা স্থির করলে যে সব কজন সেনাপতির একসঙ্গে বিচার করবে কিন্তু সেটা যে আইনবিরুদ্ধ কাজ তা তোমরা পরে অনুভব করেছ। এই ঘটনার সময় আমিই একমাত্র সভাপতি যে তোমাদের বিরোধিতা করেছিলো এবং তোমাদেরকে আইন ভঙ্গ না করতে পরামর্শ দিয়েছিলো। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম এবং এই কারণে, কর্তারা যখন আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে এবং আমাকে গ্রেফতার করার জন্যে প্রস্তুত

হচ্ছিলো, তোমরা তাদের উৎসাহিত এবং আমাকে বিদ্রূপ করেছিলে তখন আমি ভাবলাম, কারাদণ্ড ও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে হলেও আইন ও ন্যায়বিচারের পক্ষে থাকবো, তোমাদের পক্ষে নয়, যখন জানি যে তোমাদের সিদ্ধান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত।

এই ঘটনাটা ঘটেছিলো ৪০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বেআইনিভাবেই দশজন সেনাপতির দণ্ড হলো কিন্তু সক্রেটিসের বিরোধিতা এথেন্সবাসীদের মনের উপর 'গভীর ছাপ' ফেলেছিলো নিশ্চয়ই। এথেনীয় গণতন্ত্রের এই দুষ্কর্ম সক্রেটিস সমর্থন করতে পারেন নি। দ্বিতীয় ঘটনা থেকে প্রকাশ পাবে যে অভিজাততন্ত্র বা স্বৈরাচারের বিরোধিতাতেও তিনি পিছপা ছিলেন না। কোনো পরিস্থিতিতেই তাঁকে ভয় দেখানো সম্ভব ছিলো না। সেনাপতিদের বিচারের অল্পকাল পরেই গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত হলো এবং তার জায়গায় এলো বেআইনি 'তিরিশ'-এর শাসন। 'তিরিশ'-এর শাসনের পক্ষ থেকে অন্য চারজনের সঙ্গে সক্রেটিসকে আদেশ দেওয়া হলো সালামিসের লিওনকে ধরে আনতে যাতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়। অন্য চারজন হুকুম তালিম করলো, কিন্তু সক্রেটিস সোজা বাড়ি চলে গেলেন। 'শুধু কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়ে আমি দেখিয়ে দিয়েছি, মৃত্যুকে—আমি সরাসরি বলছি—মৃত্যুকে আমি এক তিল পরোয়া করি না, কিন্তু অন্যায়কে করি এবং পুরোপুরিই করি। যা দুষ্কর্ম এবং অন্যায়, ভয় দেখিয়ে আমাকে দিয়ে তা কেউ করাতে পারবে না।...এর পরে পরেই ঐ সরকারের পতন না হলে আমার হয়তো মৃত্যুদণ্ডই হতো।'

'তিরিশ'-এর শাসনকালে গণতন্ত্রীরা অনেকেই এথেন্স ত্যাগ করেছিলেন, এমন কি তাঁর শিষ্য চেয়ারেফনও। কিন্তু সক্রেটিস এথেন্স ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। গণতন্ত্রের যে কঠোর সমালোচনা সক্রেটিস করতেন তাতে তিনি নিশ্চয়ই অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এইখানে পাঠকদের জানানো দরকার, সক্রেটিসের সময়কালের গণতান্ত্রিক সমাজের চেহারাটা কিন্তু আদৌ উজ্জ্বল নয়। তাঁর জীবনের শেষ পর্বে এথেনীয় গণতন্ত্র দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। পুরো সমাজটাই দাঁড়িয়ে ছিলো দাস-শ্রমের উপর ভর করে। এরকম সমাজে গণতন্ত্রের বিলাস, ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিদেরই পোষাতো। ক্ষমতার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, দুর্নীতি, রেষারেষি, শাসনক্ষমতার অস্থির হাত বদলাবদলি ইত্যাদি মিলে এথেন্সে যে নৈরাজ্যের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে রাজনীতি ছিলো মাৎস্যন্যায়ের নামান্তর।

কিন্তু সক্রেটিস এথেনীয় গণতন্ত্রের সমালোচনা করতেন তাঁর মূল দার্শনিক অবস্থান থেকে। আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলি, সক্রেটিসের কাছে জ্ঞান ও ভালোত্ব অভিন্ন ছিলো। ভালোত্বের জ্ঞান ছাড়া ভালোত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। কথাটা তাহলে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রেও খাটে। রাষ্ট্রপরিচালনার জ্ঞান ছাড়া সঠিক পথে রাষ্ট্র কোনোমতেই পরিচালিত হতে পারে না। কিন্তু পেরিক্লিসীয় গণতন্ত্রের মূল কথাটাই হচ্ছে সকলেই রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেবার অধিকারী, ধরে নেওয়া হবে সবাই যোগ্য, যোগ্য অযোগ্য বাছাইয়ের কোনো প্রশ্ন উঠবে না। মানুষ মাত্রেই 'সর্বকর্মা'।

অতএব গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনায় জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। সক্রেটিস মনে করতেন গণতন্ত্রের এইটিই হচ্ছে মূল ব্যাধি। 'জাহাজ তৈরি করতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শের দরকার হয়, দুর্গ বানাতেও বিশেষজ্ঞ লাগে—শুধু জাতীয় নীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ ন্যায় অন্যায় স্থির করার প্রশ্নে যে খুশি উঠে দাঁড়িয়ে গেল আর কথা বলতে শুরু করলো, সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে গেল বিজ্ঞ বিচারক।' এটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হতো তাঁর। তিনি ক্ষান্তিহীনভাবে গণতন্ত্রের সমালোচনা শুরু করেছিলেন। প্লেটোর ডায়ালগ 'জর্জিয়ান'-এ দেখা যায়, সক্রেটিস পেরিক্লিস থেকে শুরু করে সমস্ত গণতান্ত্রিক নেতাদের তীব্র সমালোচনা করছেন। তখন একজন গণতন্ত্রী নেতা তাঁকে সাবধান করে দিচ্ছেন এই বলে যে সক্রেটিস গণতন্ত্রকে তোয়াজ না করতে পারলে যে কোনো সময় তাঁর বিপদ ঘটতে পারে। অনুরূপভাবে 'মেনো' ডায়ালগে এ্যানিটস (তিনজন অভিযোগকারীর একজন) একই মর্মে সক্রেটিসকে সাবধান করে দিচ্ছেন।

কিন্তু 'এ্যাপোলজি'তে সক্রেটিস যেভাবে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এসব সাবধানবাণীতে সক্রেটিস বিন্দুমাত্র কান দেন নি। তিনি এথেন্সবাসীদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে তাঁকে মেরে ফেলে তারা তাঁর সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তাঁর বদলে অন্যেরা এসে তাঁদের মুখোশ খুলে দেবেন এবং তাঁর চেয়েও নিষ্ঠুর হবেন, কারণ তাঁরা বয়সে অল্প। সক্রেটিসের কাজকর্ম থেকে ক্ষমতাসীনদের মনে এসব ধারণা জন্মানো খুবই সম্ভব যে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি গণতন্ত্র বিরোধিতার বীজ বপন করে দিয়েছিলেন যার ফলে শেষ পর্যন্ত অভিজাততান্ত্রিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ্যানিটসের মতো গণতন্ত্রী নেতারা সক্রেটিসকে যে গণতন্ত্রের জন্যে একটা আপদ বলে গণ্য করবেন সেতো স্বভাবিক। 'এ্যাপোলজি'তে সক্রেটিস বলেন :

> এথেন্সবাসিগণ, আমি আপনাদের সম্মান করি এবং ভালোবাসি ; কিন্তু আমি বরং ঈশ্বরকে মেনে চলবো, আপনাদেরকে নয় এবং যতোক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে আমি দর্শন চর্চা ও শিক্ষা দেয়া থেকে বিরত হবো না ; যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই পরামর্শ দেব। জেনে রাখুন এই হচ্ছে আমার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ এবং ঈশ্বরের প্রতি আমার যে এই...কাজ তার চেয়ে বেশি কল্যাণকর কিছু এই রাষ্ট্রে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।...ঈশ্বর আমাকে নিজের এবং অন্যদের ভিতরটা খুঁজে দেখার দায় পূরণের আদেশ দিয়েছেন।

সক্রেটিস তাঁর ভাষণের শেষ দিকে যে সমস্ত বিচারক তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশে বলেন :

> যাঁরা মৃত্যুকে অশুভ বা মন্দ বলে তাঁরা ভুল করে। মৃত্যুর পরে যদি অর্ফিয়ুস, মুসিউস, হিসয়েড আর হোমারের সঙ্গে আলাপ করতে পারা যায় তা হলে তার জন্যে মানুষ কি না দিতে পারে ? এইটাই যদি সত্য হয় তা হলে আমি বারে বারে মরতে চাই। পরলোকে অন্তত প্রশ্ন করার অপরাধে মানুষকে হত্যা করা হয় না।...বিদায় নেবার সময় এসে গেছে, আসুন নিজের নিজের রাস্তায় চলি আমরা—আমি মরতে এবং আপনারা বাঁচতে। ঈশ্বর জানেন কোন্‌টা বেশি ভালো।

মৃত্যুদণ্ড পাবার পরে সক্রেটিসকে একমাস কারাগারে কাটাতে হয়েছিলো। তাঁর মৃত্যুদণ্ড সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা যায় নি। কারণ তাঁর বিচারের পূর্বদিনে এথেন্স থেকে প্রতি বছর এ্যাপোলোর উৎসবে ডেলসে যে জাহাজ পাঠানো হতো সেই জাহাজটিকে রওনা করিয়ে দেয়া হয়েছিলো। আইন ছিলো যে এই জাহাজ ডেলসে না পৌছানো এবং সেখান থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো রকম মৃত্যুর দ্বারা এথেন্সকে কলুষিত করা চলবে না। কারাগারে এই একটা মাস সক্রেটিস তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং দূর-দূরান্ত থেকে যেসব গুণী তাঁকে বিদায় দেবার জন্যে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় কাটিয়ে দেন। এই এক মাসের মধ্যে অতি সহজে, সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারতেন। তা করার জন্যে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা কম পীড়াপীড়ি করেন নি। কিন্তু সক্রেটিস রাজি হন নি। তিনি আইন অমান্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আইনের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি সারাজীবন লড়েছেন—এখন অন্যথা করবেন কি করে? তাঁকে তো আইনসঙ্গতভাবেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সক্রেটিসের মৃত্যু হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। এতটুকু অতিশয়োক্তি না করে বলা যায়, পশ্চিমী সভ্যতার আজ যা কিছু শ্রদ্ধেয়—বুদ্ধির মুক্তি, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, গভীর স্বদেশ-প্রেম, মানবকল্যাণের আদর্শ, সুতীক্ষ্ণ, নির্মম, নির্মোহ আত্মবিশ্লেষণ প্রবল জীবনতৃষ্ণা—এসবের একটা প্রধান উৎস হচ্ছে সক্রেটিসের দর্শন এবং সন্দেহ নেই সক্রেটিস নামের মানুষটি।

প্লেটো তাঁর 'ফিডো'তে সক্রেটিসের জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টার বর্ণনা দিয়েছেন। 'ফিডো'র সেই অংশটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই বই শেষ করবো। কারণ তার পরে আর কোনো কথা নেই।

> স্নান করার জন্যে সক্রেটিস উঠে একটি ঘরে চলে গেলেন। ক্রিটো সঙ্গে যাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন। কাজেই আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। সক্রেটিস যা বলেছেন তা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলাপ চললো। আমাদের উপর কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য নেমে আসছে তা ভেবে নিজেদের অসহায় মনে হচ্ছিলো। আমাদের বাকি জীবনটাই পিতৃহীন অনাথের মতো কাটাতে হবে। স্নান হয়ে গেলে ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। একটি বড়ো আর দুটি ছোটো ছোটো পুত্রসন্তান ছিলো তাঁর। পরিবারের মহিলারা তাঁর কাছে গেলেন। ক্রিটোর উপস্থিতিতেই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দিয়ে তিনি মহিলা এবং ছেলেমেয়েদের চলে যেতে বললেন। তারপর আমাদের কাছে ফিরে এলেন। তখন সূর্যাস্ত হতে চলেছে। ভিতরে তিনি বেশ খানিকটা সময় কাটিয়েছিলেন। যাই হোক, স্নান শেষে ফিরে এসে তিনি আমাদের মধ্যে বসলেন। তারপর থেকে আর তেমন বেশি কথা বলেন নি। এই সময় 'একাদশ'দের কর্মকর্তা এলেন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'সক্রেটিস, অন্যদের নিয়ে আমাকে যে ঝামেলা পোহাতে হয়, আপনাকে নিয়ে তো সে ঝামেলা নেই। বিষ পান করতে বলার সঙ্গে-সঙ্গে অন্যেরা আমার উপর ভয়ানক খাপ্পা হয়ে ওঠে, অভিশাপ দিতে থাকে। কিন্তু যতো মানুষ আজ পর্যন্ত এখানে এসেছে তাঁদের মধ্যে

আপনিই হচ্ছেন মহত্তম। কাজেই এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নেই যে আপনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন না। কি বলার জন্যে এখন আমি আপনার কাছে এসেছি, তা তো আপনি জানেন। বিদায়, যা অবশ্য ঘটনীয় তা যতোদূর সম্ভব সহজভাবে সইবার চেষ্টা করুন।' এই কথা কটি বলে তিনি উদ্‌গত অশ্রু চাপতে চাপতে মুখ ফিরিয়ে কক্ষত্যাগ করলেন। সক্রেটিস তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনাকেও বিদায়। যেমন বললেন, তাই করবো।' তারপর আমাদের দিকে ফিরে মন্তব্য করলেন, মানুষটি কতো ভদ্র। আমি এখানে যতোদিন আছি আমার কাছে এসেছেন, আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন, তাঁকে আমার মানুষের মধ্যে যোগ্যতম মানুষ বলে মনে হয়েছে। আর এখন কি সহৃদয়তার সঙ্গেই না তিনি আমার জন্যে অশ্রু বিসর্জন করলেন। যাই হোক, ক্রিটো, লোকটির কথা মান্য করবো আমরা, তৈরি হয়ে থাকলে কেউ বিষ নিয়ে আসুক, না হলে বলো তৈরি করে আনতে।'

তখন ক্রিটো বললেন, 'কিন্তু সক্রেটিস, সূর্য তো পাহাড়ের মাথায়, এখনো অস্ত যায় নি। তা ছাড়া আমি জানি, পান করতে বলার পরেও অন্যেরা খেয়েছে অনেক দেরি করে। নিজেদের খুশিমতো পানভোজন করেছে, এমন কি কেউ কেউ তাদের আসক্তির সামগ্রী উপভোগ পর্যন্ত করেছে। এখনো সময় আছে, তাড়াহুড়ো করবেন না।'

এই কথায় সক্রেটিস বললেন, 'ক্রিটো যাদের কথা বলছো তারা এসব করেছে সঙ্গত যুক্তিতেই, আমিও সঙ্গত যুক্তিতে ওরকম করবো না। কারণ আমি মনে করি খানিকটা দেরিতে বিষ খেয়ে আমি কিছুমাত্র লাভ করবো না, মাঝখান থেকে জীবনের প্রতি এত মায়ার জন্যে নিজের কাছে নিজেই হাস্যাস্পদ হয়ে যাবো যখন জানি যে কোনো কিছুই শেষতক স্থায়ী হয় না। যাও, কথা শোনো, বাধা দিয়ো না।'

এই কথা শুনে কাছে যে বালকটি দাঁড়িয়ে ছিলো ক্রিটো তাকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। তখন ছেলেটি বেরিয়ে গেল, কিছুটা সময় কাটলো, তারপর যে লোকটি বিষ পান করাবে, তাকে সঙ্গে করে ফিরে এলো। একটি পাত্রে বিষ তৈরি করে নিয়ে এসেছে লোকটি। তাকে দেখে সক্রেটিস বললেন, 'এসব বিষয় তোমার তো ভালো জানা আছে। বলো বন্ধু, কি কি আমাকে করতে হবে?' লোকটি জবাব দিলো, 'তেমন কিছুই না সক্রেটিস, এটা খেয়ে নিয়ে একটু পায়চারি করুন। যখন পায়ের দিকটা ভারি-ভারি লাগবে তখন শুয়ে পড়বেন। এতেই কাজ হবে।' আর এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সে সক্রেটিসের দিকে বিষের পাত্রটি বাড়িয়ে ধরলো। অতিশয় প্রফুল্ল মনে পাত্রটি হাতে নিলেন সক্রেটিস, এতটুকু, এতটুকু কাঁপলেন না, এতটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না তাঁর চেহারায়। বরাবর যেমন করে থাকেন, তেমনিভাবে লোকটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'এই বিষ থেকে একটুখানি কি কাউকে উৎসর্গ করার নিয়ম আছে? কি বলো, সেটা আইনসঙ্গত কিনা? লোকটি বললো, 'যতোটা বিষ পান করা দরকার বলে মনে করি ঠিক ততোটাই আমরা তৈরি করে থাকি সক্রেটিস?' 'তোমার কথা বুঝেছি', সক্রেটিস বললেন,

'তবে দেবতাদের কাছে এটা প্রার্থনা করা নিশ্চয়ই যথার্থ ও আইনসঙ্গত যে এখান থেকে আমার বিদায় গ্রহণ সুখপ্রদ হোক। তা হলে আমি সেই প্রার্থনাই করছি।' এই কথাগুলি বলতে বলতেই তিনি শান্তভাবে সবটুকু বিষ পান করে ফেললেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত অতিকষ্টে আমরা প্রায় সবাই অশ্রুদমন করে রেখেছিলাম কিন্তু এখন তাঁকে বিষ পান করতে এবং শেষ ফোঁটা পর্যন্ত গলাধঃকরণ করতে দেখে কিছুতেই আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলাম না। সামলানোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার দুই চোখ থেকে বেগে অশ্রুর ধারা ছুটলো ; মুখ ঢেকে আমি অসহায়ের মতো আমার নিজের জন্যে কাঁদতে শুরু করলাম। তাঁর জন্যে কাঁদিনি আমি, কাঁদছিলাম তাঁর মতো মিত্রকে হারানোর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে, আমার নিজেরই জন্যে। এদিকে ক্রিটো, এমন কি আমার সামনেই, অশ্রুনিরোধ করতে না পেরে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু এ্যাপোলোডোরাস কোনোমতেই কান্না থামাতে পারলেন না, শোকযন্ত্রণায় অভিভূত মুহ্যমান হয়ে কাঁদতে কাঁদতে, বিলাপ করতে করতে তিনি একমাত্র সক্রেটিস ছাড়া উপস্থিত সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। সক্রেটিস বললেন, 'মান্যগণ্য বন্ধুরা, করছো কি তোমরা ? এই কারণেই তো আমি মেয়েদের এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি যাতে এই ধরনের কাণ্ড তারা না করতে পারে। আমি শুনেছি শান্তির মধ্যে মৃত্যুই শ্রেয়। শান্ত হও, সহ্য করো।'
এই কথা শুনে লজ্জিত হলাম আমরা, অশ্রুসংবরণ করে নিলাম। তিনি পায়চারি করতে করতে এক সময় বললেন, পা দুটি ভারি বোধ করছেন এবং এই কথা বলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। লোকটি তাঁকে এরকম করতেই নির্দেশ দিয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি সক্রেটিসকে ধরলো এবং একটু পরে তাঁর পা আর পায়ের তলা পরীক্ষা করে দেখলো। তার পরে তাঁর পায়ের তলায় জোরে চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলো তিনি কিছু বোধ করছেন কিনা। সক্রেটিস বললেন, তিনি কিছুই অনুভব করছেন না। একটু পরে আবার সে তাঁর উরুর উপর চাপ দিলো। এইভাবে উপরের দিকে আসতে আসতে লোকটি আমাদের দেখালো যে তিনি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা ও শক্ত হয়ে যাচ্ছেন। সক্রেটিস নিজেকে একবার স্পর্শ করে বললেন, বিষ তাঁর হৃৎপিণ্ডে যখন পৌছুবে তখুনি তিনি বিদায় নেবেন। ততোক্ষণে তাঁর তলপেটের আশপাশের অংশ প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠিক এই সময় মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে—কারণ তাঁকে সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হয়েছিলো—তিনি এই শেষ কথাগুলি বললেন, 'ক্রিটো, ইস্‌কিউলাপিয়াসের কাছে আমাদের একটি মোরগ মানত আছে, শোধ করে দিয়ো, অবহেলা করো না।' ক্রিটো বললেন, 'ওটা নিশ্চয় করা হবে, আর কিছু বলার আছে কিনা দেখুন।'

এই প্রশ্নের তিনি কোনো জবাব দিলেন না। একটু পরেই তাঁর সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো। লোকটি ঢেকে দিলো তাঁর দেহ। চোখ দুটি স্থির হয়ে রয়েছে দেখে ক্রিটো তাঁর মুখ এবং চোখের পাতা বন্ধ করে দিলেন।

এচিক্রেটিস, এই হচ্ছে আমাদের বন্ধুর অন্তিম যাত্রার কথা। সেই বন্ধু যিনি আমার জানামতে আমাদের কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে ন্যায়বান।

গ্রন্থপঞ্জি

History of Western Philosophy—B. Russell
A Critical History of Greek Philosophy—W. T. Stace
The Greek Thinkers—Theodor Gompers
Greek Thinkers—John Burnet
Outlines of the History of Greek Philosophy—Edward Zeller
The Greek Way to Western Civilisation—Edith Hamilton
The Greek Philosophy—W. K. C. Guthrie
A History of Political Theory—George H. Sabine
Western Political Thought—John Bowle
Dialogues of Plato.